আমি যে কি হয়েছি !

ওগো, আমি যে কি হয়েছি ! আমার লেজ ও শীং বেড়িয়েছে ! শুনেছ, আমি একজন 'নূতন কবি' হয়েছি, কথায় কথায় কবিতা লিখি, কবিতা ভিন্ন কথাই বলি না, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কবিতায় কথা বলি, প্রণয়িনীকে প্রেম পত্রখানা অবশ্যই কবিতাতেই লিখি ; পিতা মাতাকে যে কবিতায় পত্র লিখি না, এমন নহে। অনেকে বলেন, যে পদ্য লিখিতে পারে, সে গদ্য পারে না, যে গদ্য লিখিতে পারে, সে পদ্য লিখিতে পারে না ; আমার কিন্তু উভয়ে সমান অধিকার। কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ঈশ্বরগুপ্ত, ভারতচন্দ্র, দাশরথি, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, তারাশঙ্কর, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি যাঁহারা লোকের নিকট কবি ও গ্রন্থকার বলিয়া প্রখ্যাত, আমি কিন্তু তাঁহাদের ভূরি ভূরি ভুল বাহির করিয়াছি, আর ধর্ম্মত বলিতে গেলে, ইহাঁদিগকে কবি ও গ্রন্থকার বলা যায় না। কোন্‌টী ইহাঁদিগের মাথা হইতে বাহির হইয়াছে ? সবই ত সংস্কৃতের অনুবাদ, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, ভারতের অন্নদা-মঙ্গল, তারাশঙ্করের কাদম্বরী, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা, এ গুলি কি সংস্কৃতের অনুবাদ নহে ? তবে ইহাঁদিগকে কবি বা গ্রন্থকার না বলিয়া অনুবাদক বলিলে ক্ষতি কি ?

যাক্—ও সব বাজে লোকের বাজে কথায় কাজ কি ? নিজের কথা বলাই ভাল, প্রভূত কল্পনাশক্তি না থাকিলে কেহ কখন কবি হইতে পারে না, সে শক্তি আমার যথেষ্ট আছে। আমি অত্যদ্ভুত কল্পনাবলে, নীলাকাশে সৌদামিনী খেলাই, অমাবস্যায় দিবা দ্বিপ্রহরে চন্দ্রগ্রহণও দেখাইতে পারি। আমি ২।১ খান মাসিক পত্রে সময়ে সময়ে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া থাকি, লম্বা চওড়া শব্দ প্রয়োগ না করিলে আজকাল প্রবন্ধের বড় একটা আদর হয় না, তাই আমি বড় বড় নামজাদা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে ভাল ভাল শব্দ নির্ব্বাচন করিয়া (ও কিছু আমি নিজেই নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া) নিজ নিজ প্রবন্ধ মধ্যে সন্নিবেশিত করি। পাঠকগণ ! আমার রচনার ২।৪ ছত্র না পড়িলে, কেহ উহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না। তাই এ স্থলে একটু নমুনা দিলাম,—

"যখন ভগবান বিবস্বান অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, অসামান্য রূপ-

লাবণ্যসম্পন্না, লোকললামভূতা, সৌন্দর্য্যভূষিতা, অসূর্য্যম্পশ্যা বরবর্ণিনী বারাঙ্গণাগণ আগুল্ফলম্বিতভ্রমরকৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম উন্মুক্ত করিয়া, বীচীমালা-স্শোভিতা নানাবিধ সুরভি-সুগন্ধপরিপূরিত-প্রফুল্ল-প্রসূন-পরিশোভিতা কল-হাসিনী স্রোতস্বিনীর তটদেশস্থ নয়নাভিরাম ঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলোপরি পরিভ্রমণ করেন, তখন বোধ হয় যেন নির্জ্জরাঙ্গনয়াগণ কলনাদিনী হংসহাসিনী তট-নিতম্বিনী মন্দাকিনীর সলিলকণাবাহী, সুরপুরের সার সম্পত্তি, নন্দন-কানন-সঞ্জাত সুমন্দ গন্ধবহের পরিসেবনে পরিতৃপ্ত না হইয়া, দ্যুলোক হইতে ভূলোক অবতীর্ণা হইয়া, অননুভূত অনুপম সৌন্দর্য্যের বিস্তার করিতেছেন।”

দেখুন ত, কেমন অলঙ্কারের ছটা, কেমন শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য, বিশেষ-ণের বাহার! আহা, কেমন মধুরতা, সরলতা! বাহবা আমাকে! ধন্য আমার লিপিকুশলতাকে! বলিহারি আমার কল্পনাশক্তিকে! অন্যের কেমন লাগে জানি না, কিন্তু আমার লেখা আমার কাছে বড়ই মিষ্ট লাগে।

ফলতঃ যেদিন আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া আইসে, সেদিন আমার কত আনন্দ, কত স্ফূর্ত্তি! পত্রিকাখানি খুলিয়াই নিজের লিখিত প্রবন্ধটী ৫।৭ বার পড়ি, তাড়াতাড়ি মাকে গিয়ে শুনাই, দিদিকে শুনাই, ও বাড়ীর খুড়ীমাকে জেঠাইমাকে শুনাই। এই সময় জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া পাক করিতে-ছিলেন, পাকঘরে গিয়া তাঁহাকেও একবার শুনাইলাম। আমাদের কৃষাণ (চাকর), বেটা মুচী মাঠ হইতে আসিবামাত্র তাহাকেও শুনাইলাম। বাটীর বাহির হইয়া দেখি, কলু বেটা তেল বেচিতে যাইতেছে, তাহাকেও না শুনাইয়া ছাড়িলাম না। সকলেই ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিল। এই সময়ে আমার পত্নী তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন, তাঁহাকে প্রবন্ধটী শুনাইবার জন্য মন বড়ই অস্থির হইল, প্রভাতেই পত্রিকাখানি কুক্ষিগত করিয়া শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলাম। ৫ বৎসর আমার বিবাহ হইয়াছে, এখন আমি পুরাতন জামাই, সুতরাং পোষাক পরিচ্ছদের তত বেশী প্রয়োজন হইল না। না হইলেও কিন্তু লৌহশৃঙ্খলযুক্ত অচল জেব ঘড়িটী লইতে ভুলিলাম না। বেলা ৯টার মধ্যেই শ্বশুর বাটীতে পৌঁছিলাম, যাই শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ, অমনি প্রবন্ধ পাঠ। আমার শ্যালকপত্নীগণ, শালিকাগণ, শাশুড়ী প্রভৃতি সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল। সেইখানে একজন বান্দী চাকর দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ শুনিতেছিল, শুনিয়া বলিল, “জামাই বাবু কি এই

বইখান নিজে তৈয়ার করেছেন? বেশ হয়েছে।" অমনি আমার লেজটা আরও মোটা হইয়া উঠিল, মনে করিলাম, এ যেটা অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও আমার কল্পনাময়ী লেখনী বিনিঃসৃত রসময়ী রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছে। আমার শ্বশুর বাড়ীর পশ্চিমদিকে অন্য একখানি বৈটকখানায় একটা ছোকরাদলের অড্ডাখানা আছে, আহারান্তে তথায় গিয়া দেখি, ১০।১২ জন ভদ্রসন্তান একত্র হইয়া তাস পাশা খেলিতেছেন। আমার প্রবন্ধ শুনাইবার জন্য তাঁহাদের খেলা ভঙ্গ প্রতীক্ষায় তীর্থের কাকের ন্যায় হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলাম, যাই বাজী উঠিল, আর যায় কোথা? অমনি প্রবন্ধ পাঠ, তথায় দুই জন গ্রাজুয়েট, ৩ জন আণ্ডার গ্রাজুয়েট, ১ জন উপাধিধারী ডাক্তার ছিলেন, বাকী কয়েকজন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বলিলেও ক্ষতি নাই। প্রবন্ধের ২।৪ পংক্তি পড়িতে না পড়িতে ডাক্তার বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ইহা অপেক্ষা ভূদেব বাবুর ভগ্নিপতির লেখা শ্রুতিমধুর, সুখপাঠ্য ও প্রশংসনীয়।" উপস্থিত সকলেই সেই রায়ে রায় দিলেন। উচিত বলিতে কি, আমি গুরুজনের নিন্দা কুৎসা সহ্য করিতে পারি, ২।৪ ঘা প্রহার যাতনাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রবন্ধের নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, তখন --

ন সা সভা যত্র নসন্তি বৃদ্ধাঃ
বৃদ্ধা নতে যে মাধদন্তি ধর্ম্মং,
নাসৌ ধর্ম্ম যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছসে নাযু বিদ্ধং ॥

এই শ্লোকটী মনে মনে আওড়াইয়া বুঝিলাম,—

কবিতা রসমাধুর্য্যং কবের্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানী ভ্রূকুটীভঙ্গি ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ ॥

সুতরাং তথায় থাকা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় পত্রিকাখানি পকেটগত করিয়া ত্বরিতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। রোষ ও ক্ষোভে আমার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল, তৎসাময়িক অবস্থা যে কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক, তাহা আমার ন্যায় 'নূতন কবি' ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। অন্যের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু দিনমণি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া চুপে

চুপে সরিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইলে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার এক ঠান্‌দিদি আছেন, তিনি বৃদ্ধা না হইলেও বয়স্থা বটেন; এইজন্য তিনি গ্রামের ছোট বড় ভদ্রাভদ্র সকলের নিকট হইতে "বুড়মা" এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটীতে একটা স্ত্রীবৈঠক বসিয়া থাকে, পাড়ার বৌ ঝি অনেকেই তাঁহার নিকট উপন্যাস শুনিতে আইসেন, আজও সেইরূপ অনেকে আসিয়াছেন, আমি ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রদীপের সাহায্যে একনিশ্বাসে আমার প্রবন্ধটা পড়িয়া ফেলিলাম. চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। বুড়মা বলিলেন, "নাত্‌জামাই, এ বই কি তুমি ছাবিয়েছ?" আমি সগর্ব্বে বলিলাম, "হাঁ!" বুড়মা বলিলেন, "নাতজামাই, তুমি বই ছাপাতে পার,গান ছাপাতে পার না?" 'অবশ্য পারি' বলিয়া, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ন্যায় নাকি সুরে "গঙ্গে:গতিদায়িনী" গান ধরিয়া দিলাম, যেমন ভণিতার সময় "দ্বিজ সুরেশ্বর ভণে, রেখ মা রাঙ্গা-চরণে" ধরিয়াছি, আমার সম্বন্ধি বাবু কোথায় ছিলেন, তাড়াতাড়ি দাশরথির পাঁচালি খুলিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, এ গানটী কার? তুমি বুঝি "দ্বিজ দাশরথি ভণে" স্থানে দ্বিজ নাম সংযোজিত করিয়া মেয়ে মজ্‌লিসে বাহাদুরী লইতেছ? ছি, তোমার লজ্জা করে না?" আমি ত ঠকিবার পাত্র নই। অমনি সগর্ব্বে বলিয়া ফেলিলাম, "তাহা হইলে ছন্দবোধ, শব্দসাগর, শব্দাম্বুধি, প্রভৃতি অভিধানে যত শব্দ আছে, অন্যে তাহার একটীও ব্যবহার করিতে পারিবে না! কেমন, না?" সম্বন্ধীবাবু আমার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বুড়মা 'জয়জয়কার' দিয়া বলিলেন, "নাতজামাই! তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, তুমি আজ হইতে 'রত্নাকররত্ন ও কবিচতুষ্পদ' উপাধি ধারণ করিবে।" সেইদিন হইতে আমি "রত্নাকর শ্রীসুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় কবিচতুষ্পদ" হইয়াছি। এখন ভাবিয়া দেখ, আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি, আমার লেজ ও শীং বেরিয়েছে কি না?

শ্রীসুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

দাহোমি।

পশ্চিম আফ্রিকায়, গোল্ড কোষ্ট হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে আশান্তি (Ashanti) রাজ্য অবস্থিত। ইহারই উত্তর-পূর্ব্বভাগে নিগ্রোরাজ্য দাহোমি অসভ্য জাতির বর্ব্বরোচিত আচার ব্যবহারের কলঙ্ক-কালিমা বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। দাহোমি রাজ্যের রাজধানীর নাম—আবোমি। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে Ffous সর্দ্দার কর্ত্তৃক এই রাজধানী আক্রান্ত হয়। বিপক্ষীয় সৈন্যগণ গুরুতর প্রতিবন্ধক হইলে, সর্দ্দার প্রতিজ্ঞা করে যে, যদি সে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে, তবে আবোমির রাজা দাকে দেবতার নিকট বলি প্রদান করিবে। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ সে তথায় স্বীয় প্রভুত্ব ও গৌরব বিস্তারের নিমিত্ত একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া, দা রাজার উদর চিরিয়া তাহাকে অট্টালিকার আদি ভিত্তিতে সমাধিস্থ করে এবং প্রাসাদের নাম দা-ওমি (দার উদর) রাখে। তদবধি সে দাহোমির রাজা উপাধি ধারণ করে। নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহ এই নূতন রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করে।

দাহোমির মৃত্তিকা অতি উর্ব্বরা। তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ অল্প সময়ের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়। অধিবাসীবৃন্দকে Ffous বলে। তাহারা বেশি লম্বা নহে এবং অতিশয় বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। তাহারা কেশের অতি যত্ন লয়, বহুবিধ রচনা করিয়া থাকে ও অপরিমিতরূপে শরীরে তৈল মর্দ্দন করে। পুরুষে একটা ছোট কোট ও কাপড়ের একটা কোমরবন্দ ব্যবহার করে। যাহাদের সামর্থ্যে কুলায়, তাহারা বড় জামাও পরিধান করে। স্ত্রীলোকেও ঐ প্রকার জামা ব্যবহার করে। মালা, আংটি এবং অন্যান্য অলঙ্কারভারে তাহারা অতিশয় পীড়িত। তাহারা কর্ণে বড় ছিদ্র করিয়া মোটা সোনা দেয়, কেহ কেহ বা তদনুযায়ী কাংস বা পিত্তল অলঙ্কার ধারণ করে। তাহারা অতিশয় উল্কি প্রিয়, শরীরের নানাস্থানে, এমন কি, বদনমণ্ডলও তাহারা উল্কি দ্বারা বিকৃত করে।

তাল-পত্রে করিয়া তাহারা এক প্রকার রুটি ভাজে,—ইহাই তাহাদের প্রধান আহারীয়। মাংস ও মৎস আহার নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন তাহা সকলের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। স্ত্রীলোকদিগের উপর

দাহোমিবাসীগণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্ত্রীলোকগণ সুকোমল হস্তে লাঙ্গলের কঠোর মুঠো ধরিয়া ভূমি কর্ষণ করে। দেশের সমস্ত ভূমিই রাজার সম্পত্তি; প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের নিমিত্ত তাঁহাকে কর প্রদান করিতে হয়। রাজার অনুমতি ব্যতীত কোন লোকই বিবাহ করিতে পারে না। প্রকাশ্যে কোন ব্যক্তি চেয়ারে উপবেশন করিতে, বিনামা পায়ে দিতে এবং কোন প্রকার দোলায় আরোহণ করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রয়োজনের সময় সৈনিকের কার্য্য করিতে বাধ্য। সরকার হইতে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বেতন কিম্বা আহারীয় কিছুই পাইবার প্রথা নাই।

অন্যান্য আদিম ও অসভ্য জাতির ন্যায় দাহোমিবাও কুসংস্কারের দাস। চিরাচরিত ভ্রান্ত বিশ্বাস কোন প্রকারেই তাহারা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে প্রস্তুত নহে। নাগপূজা তাহাদের মধ্যে অতি সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এমন কি, ইউরোপীয় সভ্যতাপ্রদীপ্ত প্রদেশেও যে বহুকাল হইতে নাগপূজা হইয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং আমি অন্যত্র তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দাহোমিতে সর্পবধ একেবারে নিষিদ্ধ। তথায় বিষধর সর্প পুরোহিত আছে। গর্ব্বিত শীর্ষ অত্যুচ্চ মহীরুহও তাহাদের নিকট পূজ্য। লোকে আরোগ্য কামনায় ইহার পাদদেশে বলি দিয়া থাকে। নীলাম্বুপয়োধি তাহাদের আর একটী দেবতা। পুরোহিতগণ সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া সমুদ্র-দেবতার অর্চ্চনা করে এবং ভোগের নিমিত্ত তণ্ডুল, ময়দা, শর্করা প্রভৃতি নীরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বজ্রদেবও তাহাদের নিকট কম পূজনীয় নহে। পুরোহিতদিগের ক্ষমতা অসীম, তাহারা মনোমত স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া নিজেদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ্যে নৃত্য ও লাফালাফি করিয়া জনসাধারণের বিস্ময় উদ্দীপ্ত করে।

দাহোমীবাসী হিন্দুগণ পিতা প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করে। দাহোমিরাজও বাৎসরিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত হন না। তাহাদের মধ্যে দুইটী প্রথা বিদ্যমান আছে, একটির নাম 'বৎসরিক প্রথা' অপরটির নাম 'বড় প্রথা।'

বাজারের নিকট প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটী মঞ্চ নির্ম্মিত করিয়া একমানুষ উচ্চ বেড়া দ্বারা তাহা ঘেরা হয়। এই মঞ্চের উপর তাম্বু—তন্নিম্নে বৃহৎ ছত্র,

পতাকা ও বস্ত্রাদি দ্বারা সুশোভিত করা হয়। মঞ্চের উপর হইতে উপস্থিত জনসমূহকে তামাক, ভেড়ার মাংস প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। রাজমহিষীও এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার সর্ব্বপ্রধান দৃশ্য নরবলি। বধ্যগুলিকে পশ্বাদির পৃষ্ঠে চড়াইয়া বন্ধন অবস্থায় আনয়ন করা হয়। মার্জ্জার, বাজপক্ষী প্রভৃতি পশু পক্ষী আদিও বধ্যস্বরূপ নীত হয়। একজন রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলে,—'হে উপস্থিত লোকসমূহ! তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, পৃথ্বীরাজ কি বলিয়াছেন। যাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের তৃপ্তির জন্য আত্ম বলি দিতে কাতর নহে, তাহাদের জনকগণই প্রকৃত সুখী। তোমারা উপস্থিত এই যে মনুষ্য, মার্জ্জার, বাজপক্ষী প্রভৃতি বধ্য দেখিতে পাইতেছ, ইহারা অবিলম্বে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলিত হইবে! মনুষ্য মৃত মনুষ্যের আলয়ে, মার্জ্জার পশু আলয়ে, বাজ-পক্ষী পক্ষীগণবাসে যাইয়া তাহাদিগকে রাজার এই মহান অনুষ্ঠানের কথা বিবৃত করিয়া আনন্দানুভব করিবে। যখন পুরুষসিংহ নরপতি কথা বলেন, তখন মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিও।" তৎপর মনুষ্য ও পশুগুলিকে মঞ্চের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া হত্যা করা হয়। এই হতভাগ্য প্রাণীগণ পরলোকগত নরপতির নিকট যাইয়া জ্ঞাপন করে যে, তাঁহার নাম এখনও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই এবং তাঁহার বংশধরের কল্যাণের নিমিত্ত মনোযোগী হইতে অনুরোধ করে। ইহাকে 'বৎসরিক প্রথা' বলে।

রাজার মৃত্যুর পর 'বড় প্রথা' অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু রাজা পঞ্চত্ব পাইলে, তাঁহার মহিষীগণও তাঁহার সহিত এক চিতায় আরোহণ করে। তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপ করিলে পরজন্মে তাঁহাকেই স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইবে। নিগ্রোদিগেরও এইরূপ সংস্কার আছে। রাজার সদ্গতির নিমিত্ত দাহোমির বহুতর ব্যক্তিকে স্ত্রীপুত্র পরিজনসহ হত্যা করা হয়।

দাহোমিতে নরবলি খরতর বেগে প্রবাহিত ছিল। রাজপ্রাসাদ পরি-বেষ্টিত মৃন্ময় প্রাচীর গাত্রে বহুতর হতভাগ্যের মস্তক, অস্থি প্রভৃতি সংবিদ্ধ থাকিত। রাজ-আবাসের দেওয়াল নরমস্তকে সুশোভিত করা হইত। যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কশায়িনী করিতে পারিলে, বিজয়ী সেনাপতি পানার্থে নরমস্তক প্রাপ্ত হইত। তদ্দেশবাসীগণ এইরূপ নরহত্যায় আনন্দা-নুভব করিত। 'বাৎসরিক প্রথায়' বধ্য আনীত হইলে, উপস্থিত জন-

সমূহ চীৎকার করিয়া বলিত,--'রাজন্! আমরা অতিশয় ক্ষুধাতুর হইয়াছি, আহার্য্য প্রদান কর।' তাহাদের বিশ্বাস, যদি বলি না হয়, তবে রাজ্যের গৌরব বিনষ্ট হইবে।

আমাজন্ (Amazons) অথবা স্ত্রী-সৈন্যের নিমিত্ত দাহোমি প্রসিদ্ধ। তিন বৎসর পর এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রত্যেক অধিবাসী তাহাদের পূর্ণযৌবন-সম্পন্না সকল দুহিতাকে রাজসদনে উপস্থিত করে। উচ্চশ্রেণীয় স্ত্রীগণের মধ্য হইতে পদস্থ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিতা হয়। নীচ শ্রেণীয়ারা সাধারণ সৈনিক শ্রেণীতে অধিকার লাভ করে। দাসসন্তানগণ তাহাদের সহচর্য্যে নিযুক্ত হয়।

কাল এবং সাদা রেখাবিশিষ্ট এক প্রকার পোষাক স্ত্রীসৈনিকেরা পরিধান করে ও স্কন্ধে বন্দুক লয়। তাহারা বিবাহ করিতে পারে না। প্রাসাদের ফটকের নিকট একটী দেবতামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা বলে, কোন স্ত্রীলোক বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, দেবতা তাহা বলিয়া দেন। অপরাধী চরমদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

স্ত্রীসৈন্য তিনদলে বিভক্ত, প্রত্যেক দলের কেশ রচনার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের এবং প্রত্যেক দল স্ত্রী-সেনাপতি ও স্ত্রী-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক শাসিত ও চালিত হয়। এক দলকে ক্ষুর যোদ্ধা বলে, কারণ তাহাদের সঙ্গে একখানি করিয়া ক্ষুর থাকে। বিপক্ষ নরপতিকে ধৃত করিতে পারিলে এই ক্ষুর দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করে।

স্ত্রী-যোদ্ধাগণ যখন অগ্রসর হয়, তখন দ্বাদশটী নরমস্তকে অলঙ্কৃত একটী জয়ঢক্কা রণবাদ্য করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হয়। তাহারা পল্লী আক্রমণ করিতে অভ্যস্ত। পল্লী উচ্চ প্রাকারে পরিবেষ্টিত থাকিলে, তাহারা অনায়াসে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। তাহাদিগকে শিক্ষিতা করিবার অভিপ্রায় ঘন কণ্টকিত জঙ্গল প্রস্তুত করা হয় এবং তাহাদিগকে তন্মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। উন্মত্ত হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাহারা জঙ্গলের মধ্য দিয়া গমন করে, কণ্টক কিম্বা কোনরূপ বাধা বিপত্তিতে তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। রাজা তাহাদিগকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে এবং শত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহাদিগকেই নিযুক্ত করেন। তাহারা দাস ধৃত করিয়া বাজার হিতের জন্য বিক্রয় করে কিন্তু ইহা প্রভূতাংশে মন্দীভূত হইয়াছে। শত্রুকে দূর করিতে পারিলে তাহাদিগের নিমিত্ত বিশেষ অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হয়।

স্ত্রীগণ রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে। তাহারা তাঁহার পাদদেশে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ধূলি মস্তকে দিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখায়। নর-খুলির উপর স্থাপিত একখানি আসনে রাজা পদ রাখিয়া উপবেশন করেন, তাঁহার ছড়ির উপরিভাগে একটী নরমস্তক আছে এবং তাঁহার বড় পানপাত্রও একটী নর-খুলি।

অতীত যুগের এই সকল কাহিনী শ্রবণ করিলে বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং হতবুদ্ধি হইতে হয়। প্রাণীবধে তাহাদের প্রবলতর অনুরাগ, ক্রীত-দাসের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার প্রভৃতির কথা স্মরণ করিলে অতি নির্মম হৃদয়ও ব্যথিত ও বিগলিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতালোক ইতস্তত: বিকীর্ণ হওয়ায় তাহারা এখন অনেকাংশে সভ্য হইয়াছে, বর্ব্বরো-চিত অনেক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। দাস-দিগকে মুক্ত করিবার জন্য Gold coast এ আমেরিকারা Liberia নামক একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে এবং প্রভু যীশুর প্রিয়তম শিষ্যদিগের কল্যাণে বর্ত্তমান সময়ে অনেক নিগ্রো জর্ডনের পবিত্র সলিল মস্তকে দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অলিঙ্গন করত: চতুর্দ্দশ পুরুষ সহ নিজকে পবিত্র করিতেছে এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিকে মিশনারী স্কুলে শিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের সহায়তা করিতেছে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

অন্ন চিন্তা চমৎকার।

কালিদাসকে তর্কে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে একদা বররুচি প্রভৃতি নবরত্নগণ কালিদাসের পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমরা কিছুতেই কালিদাসকে পরাস্ত করিতে পারি নাই। অদ্য কালিদাস যখন রাজসভায় যাত্রা করিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে "ঘরে অন্ন নাই" এই কথা তিনটী মাত্র বলিবে। কালিদাস-পত্নী স্বীকৃতা হইলে রত্নগণ প্রস্থান করিলেন। পরে কালিদাস উত্তরীয় বসন লইয়া রাজসভায় যাইতে

উদ্যত হইলে তাঁহার পত্নী আসিয়া একগাল হাসি হাসিয়া বলিল,—"ঘরে অন্ন নাই।"

কালিদাস চিন্তাকুলিতচিত্তে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে একটী সমস্যা পূরণ করিতে বলিলে, কালিদাস বলিলেন,—

দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকার কাতরে কবিতা কুতঃ।

মহারাজ! দরিদ্র ব্যক্তির গুণ সকল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রকাশ হইতে পারে না। অন্নচিন্তা অতি চমৎকার, দরিদ্রের কবিতা স্ফুরণ কেমন করিয়া হইবে?

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

এক যবনাধম জোলা তাহার উপপত্নী লইয়া কোন গ্রামে যাইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া বাস করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবস পর তাহার একটী কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল। কন্যা দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে বিবাহের যোগ্য হইলে জোলা সুব্রাহ্মণ জামতা অন্বেষণ করিতে লাগিল।

বহু অনুসন্ধানের পর ভগবান জোলার আশা পূর্ণ করিলেন। এক হাড়ী আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া তদীয় পুত্রের সহিত জোলার কন্যার বিবাহ দিল, এবং উভয়েই নিজ নিজ চাতুর্য্যের জন্য আনন্দসাগরে মগ্ন হইল।

কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, একদা দুই বৈবাহিক গল্প করিতেছে। গল্পব্যপদেশে হাড়ী আর মনের কথা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিল,—"বেয়াই, তোমার আর সন্ধ্যা আহ্নিকে প্রয়োজন নাই। যখন আমার সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছ, তখন তোমার কুল অতি উজ্জ্বল হইয়াছে। আমি জাতিতে হাড়ী, আমার পুত্র হাড়িনীগর্ভজাত।"

বৈবাহিকের কথা শুনিয়া জোলা কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া বলিল,—

ভার্য্যা মে নটকী চেয়মহঞ্চ জবনাধমঃ।
জামতা হড্ডকশ্চৈব যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে॥

হে বৈবাহিক প্রবর, অযোগ্য ব্যক্তিতে কখন যোগ্যতার যোজনা হয় না। আমি অধমাধম,—আমার ভার্য্যা নটকী, তদুপরি জামতা হাড়ী হইলেন। সুতরাং পরমেশ্বর যোগ্যের সহিত যোগ্যেরই মিলন করিয়াছেন।

যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।

বিবাহের পূর্ব্বে একদা সুন্দর পরিহাস করিয়া বিদ্যাকে কোন একটী কথা বলিলে,—

সুন্দরী বুঝিয়া ছলে, মুচকি হাসিয়া বলে,
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলে না হয় প্রত্যয় ॥

সুন্দর ইহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে, বিদ্যা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বগত চিন্তা করে,—

শুনি মনে মনে ধনী, বাখানে নাগর মণি,
বিনামূল্যে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ,
এড় মেনে হারিনু তোমার ॥
পুরুষের ভার যাহা, রমণী কি পারে তাহা,
তুলিতে আপন ভার ভারি।
আজি জানিলাম দড়, পুরুষ নির্লজ্জ বড়,
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে, তাহার এ গুণ আছে,
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
* * * * * *
লাজে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল, কেমনে এমন বল,
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কার্য্য তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে,
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥

ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকঃ।

প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য সকল প্রকার ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইলে, পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল ত বাপু, তুমি কোন্ প্রভাবে আত্মরক্ষা করিতেছ ?" তখন ধার্ম্মিকপ্রবর প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—"জান না, বাবা ! ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকঃ।" অন্যচ্চ—

জলপন্তি সুরয়ঃ সর্ব্বেধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকঃ।
এতজ্ জ্ঞাতব্য মদৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি ॥

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।

এক ব্যক্তি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন,—

যাতঃক্ষাম খিনাংপ্রদায় হরয়ে পাতাল মূলং বলিঃ
শক্তুপ্রস্থ বিসর্জ্জনাৎ সচমুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতীসুরপুরীং কুন্তী সমারোহরাৎ
হাসীতাপতিদেবতা গমদধো ধর্ম্মস্যসূক্ষ্মগতিঃ ॥

বলিরাজা শ্রীকৃষ্ণকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া পাতাল গমন করিলেন, কিন্তু ঋচীক মুনি একপ্রস্থ শক্তু (ছাতু) দান করিয়াই স্বর্গে স্থান পাইলেন। আবাল্য অসতী কুন্তীদেবীও স্বর্গে স্থান লাভে অধিকারিণী হইলেন অথচ পতিব্রতা সাধ্বী সীতার অধোগতি হইল। হায়, ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি অর্থাৎ সহজে বোধগম্য নহে।

কালস্য কুটিলাগতি।

মেঘনাদ রণে হত হইলে রাবণ বলিয়াছিলেন,—

* জলপ্লবন্তি পাষাণামানুষাঃ হন্তি রাক্ষসান।
কপরঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি কালস্য কুটিলাগতি ॥

জলে প্রস্তর ভাসিতেছে, মনুষ্যে রাক্ষস বধ করিতেছে, কপি সকল কার্য্য করিতেছে! কালের কি কুটিলগতি, অর্থাৎ কখন কি হয় বলা যায় না!

(ক্রমশঃ)

* রামায়ণ।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

দৈবী বিচিত্রা গতিঃ।

কান্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া কান্তান্তকালোধুনা।
ব্যাধো ভো ধৃতচাপনিশিতশরঃ শ্যেন পরিভ্রাম্যতি॥
ইত্থং সত্যমহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেন হত।
স্তূর্ণং তৌ তেষামালয়ম্পবিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলে, এক বৃক্ষ সমারূঢ়া কপোতি, ব্যাধ ও শ্যেনপক্ষীকে অবলোকন করিয়া, ব্যাকুলিতচিত্তে তদীয় স্বামী কপোতকে বলিতেছে যে, হে নাথ! আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। ঐ দেখ, নিম্নে ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান, আর ঐ দেখ, অম্বরে শ্যেনপক্ষী পরিভ্রমণ করিতেছে। এরূপ স্থলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

ব্যাধ শরত্যাগ করিবে, এমন সময় একটী সর্প ব্যাধকে দংশন করিল। দংশিত হইবামাত্র তাহার হস্তের শরও নিক্ষিপ্ত হইয়া শ্যেনপক্ষীর উদরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ ছিন্নদ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া বলি বলিলেন,—"দৈবের কি বিচিত্র গতি।" সত্যই—

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

অদৃষ্টই প্রধান। অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। সমুদয় দেবগণ মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিলেন, কিন্তু—

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরেবির্ষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥

বিষ্ণুর কপালে লক্ষ্মী লাভ হইল, আর ভোলানাথের কপালে তীব্র হলাহল মিলল। তাই বলিতেছি—

কপালঃ কপালঃ কপালঃ মূলঃ।

কপালই মূল।—

স্বয়ম্ভুঃ শিবশক্তি বিষ্ণুঃ
কপাল দুঃখ' ন করোতি দূরম্।

অতঃ পরো জীবঃ স্বকর্ম্মভোগী
বপালঃ কপালঃ কপালঃ মলঃ ॥

তীর ভর জমি।
কুলা ভর ধান ॥

এই প্রবাদটি রাঢ়দেশে সমধিক প্রচলিত। মানভূমিতে পাঞ্চম নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে জমির কর এতই অল্প ছিল যে, জমির এক প্রান্ত হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে উহা যত দূরে পতিত হইত, তৎপরিমিত জমির কর এককুলা ধান।

সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।

অতিশয় বাড়াবাড়িটা কোন কাজের নয়। এক ব্যক্তি তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—

অতি দানে বলির্বদ্ধো অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অত্যুগ্রো রাবণো নষ্টঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং ॥

অতিশয় দাতা বলিয়া বলি পাতালে বদ্ধ হইলেন, অতিশয় মান করিয়া কৌরবরা সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, অতিশয় উগ্রস্বভাব প্রযুক্ত রাবণ নির্বংশ হইলেন। সুতরাং 'অতি বড়' কথাটাই ভাল নয়।

সমূলস্তু বিনশ্যতি।

মন্ময়ক্তস্য বিবোধেন দাবোদবনিবাসিনঃ।
শিংশপামূলপর্যাভ্যাং সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

রাজপুত্র রাত্রে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় একটী সূক্ষ্ম সর্প তাঁহার নাসারন্ধ্র দিয়া উদরে প্রবিষ্ট হইল। পরদিবস হইতে রাজপুত্রের উদরাময় পীড়া হইল। ক্রমে ক্রমে উদর স্ফীত হইতে লাগিল। রাজপুত্র জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় রাজপুত্র এক শিংশপা বিটপিমূলে রজনী অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে শয়ন করিলেন।

পথপর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় নৃপনন্দন শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। উক্ত বৃক্ষমূলে এক বিবরে একটা সুবৃহৎ অজগর অপরিমিত ধন রক্ষা করিয়া যক্ষের ন্যায় বাস করিতেছিল। রাজপুত্র নিদ্রিত হইয়াছে মনে করিয়া, ঐ সর্প উদরস্থ সর্পকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"রে খল, তুই কি জন্য অকারণে একটা রাজপুত্রকে কষ্ট দিচ্ছিস্? রাজার বিনাশ অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট কি হইতে পারে? তুই কি জানিস্ না, রাজাই শান্তি স্থাপন করেন?"

এতৎশ্রবণে উদরস্থ সর্প গর্জিয়া বলিল,—

"রে অধম, তুই কি জন্য রাজ্যের সমদন অর্থ অপহরণ করিয়া যক্ষের ন্যায় রক্ষা করছিস্? উহার দ্বারা রাজার কত উপকার হইতে পারে।"

সর্পদ্বয়ের বিবাদে রাজপুত্রের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু উহাদের কলহ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তদবস্থায় রহিলেন।

প্রথম সর্প পুনরায় বলিল,—

"তুই যেমন রাজপুত্রকে বিনাশ করছিস্, রাজপুত্র যদি এই শিংশপা বৃক্ষের পত্রের রস পান করেন, তবেই তোর উপযুক্ত শাস্তি হয়।"

উদরস্থ সর্প সরোষে বলিল,—

"রে পাপিষ্ঠ, তুই যেমন আমার মৃত্যুকামনা করছিস্, রাজপুত্র যদি এই শিংশপার মূলের রস তোর গর্ত্তে ঢালিয়া দেন, তাহা হইলেই তোর তর্জ্জন গর্জ্জন নিমেষের মধ্যে নিবারিত হইবে।"

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, রাজপুত্র উক্ত বৃক্ষপত্রের রস পান করিলে উদরস্থ সর্প ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া নির্গত হইল, পরে উক্তপ্রকারে বিবরস্থ সর্পকেও প্রথমের পথের পথিক করিয়া, সুরক্ষিত বিপুল অর্থভাণ্ড গ্রহণ করতঃ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মর্ম্মজ্ঞের বিরোধে উদরস্থ ও গর্ত্তস্থ সর্পদ্বয় শিংশপাবৃক্ষের পত্রের ও মূলের রসে সমূলে বিনষ্ট হইল।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

মহাপুরুষদিগের চরিত্রের সহিত এই উক্তির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। একদা রাজা জন্মেজয় পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া সস্ত্রীক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিতেছেন, এমন সময় ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ দক্ষিণা লইতে উপস্থিত হইলেন।

ঋষির মস্তকে দুইটী শৃঙ্গ দেখিয়া মহিষী সলজ্জ হাস্য করেন। মুনিও তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। রাজা তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ঋষিকে প্রহার করেন। মুনিও তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। রাজা মুনি-শাপে অত্যন্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া তাঁহারই শরণাগত হইলেন। পরে মুনি রাজার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, শাপ বিমোচনের উপায় বলিয়া দেন। এই ঘটনা দেখিয়া কাহার না মনে হয় যে, মহাপুরুষদিগের চিত্ত "বজ্র হইতেও কঠিন, কুসুম হইতেও মৃদু।"

স্থানে স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।

একদা মহাদেবের নিকট গরুড় উপস্থিত হইলে, কালকণ্ঠের মস্তকস্থিত সর্প সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গরুড় বলিল,—

জানামি রে সর্প তব প্রভাবং
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানে স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

অরে সর্প, তোদের প্রতাপ আমি বেশ জানি, শঙ্করের কণ্ঠে আছিস্ বলিয়া এত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিস্। আমি বেশ জানিলাম, স্থানই প্রধান, বল প্রধান নহে। কেন না, স্বস্থানে অবস্থান করিলে কাপুরুষও সিংহ তুল্য বিক্রম প্রকাশ করে।

আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।

এক রাজকন্যার সহিত তত্রস্থ কোটালের গুপ্ত প্রণয় ছিল। বাটীর সকলে নিদ্রিত হইলে রাজকন্যা প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী এক ভগ্ন শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রণয়ীর সহিত রাত্রিবাস করিয়া প্রত্যূষে গৃহে আসিয়া শয়ন করিত। কিয়দ্দিবস পর রাজকন্যার স্বামী উপস্থিত হইলেন। রজনীতে আহারাদি করিয়া জামাতা শয়ন করিলে রাজনন্দিনী কোটালের নিকট গমন করিল। আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, কোটাল রাজকন্যাকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। রাজকন্যা বিনয়নম্রবচনে উপপতিকে বলিল,—

"প্রাণেশ্বর, অদ্য আমার বিবাহিত স্বামী আসিয়াছে। তাহাকে যদিও আমি দেখিতে পারি না, তত্রাচ লোকলজ্জার ভয়ে তাহার নিদ্রা পর্য্যন্ত আমাকে তাহার নিকট থাকিতে হইয়াছে। এইজন্যই আজ আসিতে বিলম্ব হইল।"

রাজকন্যার কথা শুনিয়া কোটাল আরও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া তাহাকে গুরুতর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কন্যা ছিন্নভিন্নবেশা আলুলায়িত কুন্তলা হইয়া উপপতির পদ ধারণ করিয়া বলিল,—

"হৃদয়সর্ব্বস্ব। ভালবাসি বলিয়া কি এত কষ্ট দিতে হয়? আমি তোমার চরণ ধরিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমা বই আর কাহাকেও জানি না। তুমি যদি আমাকে চরণে স্থান না দাও, তবে এই দণ্ডেই আত্মহত্যা করিব।"

রাজকন্যার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোটাল বলিল,—"তুমি যদি কেবল আমার হও, তবে এইদণ্ডেই তুমি তোমার স্বামীর মস্তক ছেদন করিয়া আসিয়া আমাকে দেখাও।"

রাজসুতা তৎক্ষণাৎ নিজগৃহে গমন করিয়া এক শাণিত খড়্গ দ্বারা স্বামীর মস্তক ছেদন পূর্ব্বক হর্ষান্তঃকরণে উপপতির নিকট উপস্থিত হইল। কোটাল রাজ-জামাতার রুধিরাক্ত মস্তক দেখিয়া প্রণয়িনীকে বলিল,—"চল, আমরা এস্থান হইতে পলায়ন করি।" রাজকন্যা সহজেই সম্মতা হইল।

কিয়দ্দূর পলাইয়া আসিয়া তাহারা এক নদীর তীরে উপনীত হইল। তীরে কোটাল বলিল,—

"প্রিয়ে, তোমার অলঙ্কারগুলি তোমার পরিধেয় বস্ত্রে বাঁধিয়া আমাকে দাও, আমি পর-পারে রাখিয়া আসি। তারপর তোমাকে পার করিয়া লইয়া যাইব।" রাজকন্যা কথামত কার্য্য করিল।

অলঙ্কারাদি লইয়া পর-পারে যাইয়া কোটাল বলিল,—"যে উপপতির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত স্বামীর মস্তক ছেদন করিতে পারে, এমন কঠিন হৃদয়া রমণীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া কোটাল একাকী প্রস্থান করিল।

উলঙ্গ অবস্থায় কোথায় যাইবে? রাজকন্যা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া অম্বু অম্বরে লজ্জা নিবারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর এক শৃগাল একখণ্ড মাংস মুখে করিয়া তথায় আসিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে জলে একটী মৎস্য দেখিয়া, স্থলে মাংস

রাখিয়া মৎস্য ধরিতে নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। মৎস্য তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। ইত্যবসরে একটী নকুল আসিয়া মাংস খণ্ডটি লইয়া প্রস্থান করিল।

শৃগাল নিরাশ হৃদয়ে স্থলে আসিয়া দেখে, তাহার মাংসখণ্ড নাই, অনন্তর শৃগাল মাংস অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, বান্ধবস্থা জলমধ্য হইতে বলিল যে, নকুলে মাংস লইয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়াছে। তোমার মাংসও গেল, মৎস্যও গেল,—এ-কূল ও-কূল দু-কূল গেল। এখন আর কি দেখিতেছ?

তদুত্তরে শৃগাল বলিল,—

আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
জাবস্যাথে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠতি নগ্নিকা॥

পরের ছিদ্র অনুসন্ধান কর, কিন্তু নিজের ছিদ্র দেখ না। তুমি নিজেই উপপতির নিমিত্ত স্বামীকে হত্যা করিয়া এখন উলঙ্গিনী হইয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ।

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ঘটকর্পূর বলিয়াছেন,—

অঙ্কস্য দোষোগুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি চোরভাবে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষোগুণরাশিনাশী॥

যাঁহারা বলেন যে, চন্দ্রের কলঙ্ক চন্দ্রের গুণরাশিতে ঢাকিয়া থাকে, আমার মতে তাঁহারা কিছু দেখেন না, কারণ একটীমাত্র মহদ্দোষে সমস্ত গুণরাশিকে নষ্ট করে, যেমন এক দারিদ্র্য দোষে সমস্ত গুণরাশি বিনষ্ট হয় অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তির গুণরাশি প্রকাশ হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না।

ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।

মহাকবি কালিদাস একদা কোন রমণীর কক্ষদেশে জলকুম্ভ দেখিয়া রহস্য করিয়া বলিতেছেন,—

শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়ন শতংশ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতিদাহানলঃ।

যৎকান্তাকুচকুম্ভপার্শ্ববাহুলতিকাহিল্লোললীলাসুখং।
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে॥ (১)

হে কুম্ভ, তোমাকে শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা যে শতবার আঘাত করা হইয়াছে, তাহা শ্লাঘ্য মনে করি; শুষ্ক করিবার নিমিত্ত তোমাকে যে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাও শ্লাঘ্য মনে করি। তৎপর কর্দ্দম দ্বারা যে তোমার শরীরে প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল এবং পরে অগ্নিতে যে তোমায় দগ্ধ করা হইয়াছিল, সকলি শ্লাঘ্য মনে হয়। কেন না, তুমি এখন রমণীর কুচকুম্ভের পার্শ্বস্থ বাহুলতার হিল্লোল সুখ অনুভব করিতেছ। তোমার পূর্ব্ব দুঃখ সার্থক হইল,—যেহেতু দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।

বেগারের প্রথাটা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বত্রই ছিল ও আছে। বড় বড় জমীদারগণ অধীনস্থ লোক ধরিয়া আনিয়া বিনাবেতনে কেবলমাত্র খাইতে দিয়া যদৃচ্ছাক্রমে খাটাইয়া লইত। সময় সময় কোন কোন হিন্দু ভূম্যধিকারী বেগার ধরিয়া তীর্থযাত্রা করিতেন। এই সকল বেগারদের আর কোন লাভ না হইলেও গঙ্গাস্নানটা লাভ হইত। তাহাদের নিজের এমন কোন সামর্থ্য নাই যে, খরচপত্র করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আইসে, তবে একজন সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া গঙ্গাস্নানটা হইল।

মুসলমানদিগের সময়েও এই বেগার লওয়া চলিত ছিল। তাহার প্রমাণ নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যে।—

দিল্লীর ওপারে ত আর বেগার নাই। (২)

এই সকল অধীনলোকদিগের বেগার না খাটিয়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ জমীদারকে ভয় করে না, এমন প্রজা অতি কম,—বিশেষতঃ সেকালে। জমীদারের সুখেই প্রজার সুখ, তাঁহার দুঃখেই প্রজার দুঃখ। ঠিক যেন—

(১) শৃঙ্গারতিলকং।

(২) বেগার লওয়া যে হিন্দু ভূম্যধিকারীদিগের নিয়ম ছিল এমন নহে; বঙ্গে মুসলমান রাজ্য বিস্তার হইলে, তাঁহারাও বেগার লইতে বড় অনিচ্ছুক হইতেন না। বরং তখন এই অত্যাচারের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। সময় সময় বেগার সুদূর দিল্লী পর্য্যন্ত প্রেরিত হইত। এই সকল গরিব-

তস্মিন্‌স্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং।

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্‌স্তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ (৩)

সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি পুণ্ডরীকাক্ষ তুষ্ট হউন। যে হেতু তাঁহার তুষ্টে জগৎ তুষ্ট এবং তিনি তৃপ্ত হইলে সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হয়।

কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করিয়া জমীদারের বা রাজার বা তৎকর্ম্মচারীর মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহারা সুখে থাকিতে পাইত না। কারণ প্রায়শঃই তাহাদিগকে কোন না কোন বিপদে ফেলিবার ষড়যন্ত্র হইত। বিপদ-জাল হইতে মুক্ত হইবার মানসে কর্ত্তাকে উপঢৌকন দিলে সেই মুহূর্ত্ত রক্ষা পাওয়া যাইত। কিন্তু তৎপরে—

কা কস্য পরিবেদনা।

কার কি পরিবেদনা?

এক বৃক্ষসমারূঢ়া নানাপক্ষিবিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতেতু দিশং যান্তি কা কস্য পরিবেদনা॥
কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরাঃ।
কায় প্রাণৈর্ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥
বনানাং বনকাষ্ঠানাং নদীস্রোতঃ সুসঙ্গমঃ।
সঙ্গমে পুনর্ভঙ্গঃ কা কস্য পরিবেদনা॥
সুদূরাস্তপথশ্রান্তাচ্ছায়াং যান্তি চ শীতলাং।
শীতলাশ্চপুনর্য্যান্তি কা কস্য পরিবেদনা॥

লোকদিগের যে কি কষ্ট হইত, তাহা বর্ণনাতীত। নিম্নশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারীরা আবার এই বেগারের ভয় দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে ক্রটি করিত না। যখন দুঃখী প্রজাবৃন্দ এইরূপ উত্যক্ত হইত, তখন তাহারা ঘুস দেওয়া অপেক্ষা বেগার দিতে স্বীকৃত হইত এবং বলিত, "দিল্লীর ওপারে ত আর বেগার নাই।" অর্থাৎ বেগার দিতে হয় দিব এবং জোর দিল্লী পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারিবে, তাহার ওদিকে ত নহে।—বসু প্রণীত প্রবাদ পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(৩) স্মৃতি।

অসারঃ খলু সংসারঃ।

ইহার মূল জানেন কি? কোন রসিক কবি কহিতেছেন,—

অসারঃ খলু সংসারঃ সারং শ্বশুরমন্দিরং।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥

এই অসার সংসারে, একমাত্র শ্বশুবালয় কেবল সার বস্তু। ঐ দেখ, মহাদেব তাঁহার শ্বশুরালয় হিমালয়ে এবং বিষ্ণু মহোদধিতে সুপ্ত আছেন।

অন্যচ্চ—

অসারে খলু সংসারে পূজ্যাঃ সারঙ্গলোচনা।
তদর্থং ধনমিচ্ছন্তি তৎত্যাগেতু ধনেন কিম্॥
অসারে হীহসংসার সারভূতা নিতম্বিনী।
ইতি সঞ্চিন্ত্য বৈশম্ভুরর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতীং দধৌ॥ (৪)

পুত্রের অন্নপ্রাশনের পর সুন্দর যখন বিদ্যাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বিদ্যা তখন বলিয়াছিলেন,—

---

(৪) বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিতে করিতে এক সময়ে চৈত্র মাসে বসন্তোৎসবের সময় সমস্ত অন্তঃপুর-বধূগণের সহিত বিহারার্থ ক্রীড়া-কাননে গমন করিলেন। নানাবিধ তরু সমূহে সুশোভিত সেই বিহার স্থান ইন্দ্র নীলমণি দ্বারা খচিত, ভিত্তি দ্বারা রমণীয়, চন্দ্রকান্তি শিলা নির্ম্মিত, নানাবিধ ধূপবাসিত অঙ্গন-মধ্যে বিহারার্থ বস্ত্রপুষ্পাদি শোভিত পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চতুর্ব্বিধ বনিতাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই বিহারবনের সন্নিধানে একটী চণ্ডিকার আয়তন ছিল, তাহাতে এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি রাজাকে তথায় রমণীগণারত দেখিয়া আপন মনে চিন্তা করিলেন, আমি তপস্যা করিয়া বৃথাই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। বিষয়-সঙ্গ-সুখ স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। কথিত আছে—

* * * * *

এই অসার সংসার মধ্যে ললনাগণই পূজনীয়া, তাহাদের নিমিত্তই ধন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ধন লইয়া কি হইবে? আরও এই অসার সংসার মধ্যে নিতম্বিনীগণই সারবস্তু, এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বয়ং শঙ্কর পার্ব্বতীকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিয়াছেন।"—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা।

আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে রাখিলা হরি হিমালয়ে হর॥ (৫)

এ অক্ষম লেখকের শ্বশুরবাড়ীও নাই, ও রস আস্বাদনও করে নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিলে অনধিকার চর্চ্চা হইবে। অথবা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—

নাস্তিগ্রামঃ কুতঃ সীমা।

নাস্তিগ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তিবিদ্যা কুতোযশঃ।
নাস্তিজ্ঞানং কুতোমুক্তি ভক্তির্নাস্তি কুতোঽস্তিধীঃ॥

গ্রাম নাই তার সীমা কোথায়, বিদ্যা নাই তার যশ কোথায়, জ্ঞান নাই তার মুক্তি কোথায় এবং ভক্তি নাই তার জ্ঞান সঞ্চারের সম্ভাবনা কোথায়?

যদি আমার দোষই হইয়া থাকে, তবে মহোদয় পাঠকগণ শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করুন। অনেক জিনিষই ত প্রক্ষেপে শুদ্ধ হয়।

পন্থা বাতেন শুদ্ধতি।

রজসা শুদ্ধতে নারি কাষ্ঠশুদ্ধতি তক্ষণাৎ।
তাম্রমম্লযোগেন পন্থা বাতেন শুদ্ধতি॥

রজোযোগে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়, কাষ্ঠ চাঁচিলে শুদ্ধ হয়, তাম্র অম্লযোগে পরিশুদ্ধ হয় এবং পথ বায়ুদ্বারা শুদ্ধ হয়।

অথবা কিছু কাঞ্চন মূল্য প্রদান করুন, কেন না—

দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি।

ফলস্তু ক্ষালনাৎ শুদ্ধেৎ গোময়েন গৃহস্তথা।
ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি॥

ফল প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, গৃহে গোময় লেপ করিলে পবিত্র হয়, বসন ক্ষারযোগে শুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যতেই শুদ্ধ হয়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

---

(৫) বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্র।

রত্নমালা।

পিতা মাতা শিশু-সুতে কিম্বা সতী স্ত্রীরে
শত অপকার্য্য করি পোষিবে সংসারে ॥
অর্থাতুর নর নাহি মানে বন্ধু পিতা।
কামাতুরে লজ্জা ভয় কে দেখেছ কোথা ?
চিন্তাতুর অভাগার নাই নিদ্রা-সুখ
ক্ষুধাতুরে বল, তেজ সতত বিমুখ ॥
নদী নখী অস্ত্রধারী অথবা শৃঙ্গিরে।
বিশ্বাস কর্ত্তব্য নয় রাজা রমণীরে ॥
স্থানাভাব হয় কিম্বা মিলে না সময়।
অথবা প্রার্থনাকারী উপস্থিত নয় ॥
তথে নারী সতীত্বের ছায়া মাত্র রাখে।
অন্যথায় ললনার স্বধর্ম্ম না থাকে ॥
নরপতি ইষ্টদেব অথবা দেবতা।
রিক্ত হস্তে দরশন নিষিদ্ধ সর্ব্বথা ॥
লক্ষ্মী বিনা বাক্য কভু শোভা নাহি পায়।
ধান্য বিনা গৃহস্থের গৃহ গণ্য নয় ॥
যৌবন অভাবে শুধু কি করে সৌভাগ্য ?
জ্ঞানাভাবে সম্ভবে কি কখন বৈরাগ্য ?
দুর্জ্জনের শান্তিলাভ হইবার নয়।
পাষণ্ডের বুদ্ধি কভু সৎ নাহি হয় ॥
বেশ্যার প্রীতিরে, আস্থা কভু না করিবে ;
খলের মিত্রতা-মুগ্ধ কখন নহিবে ॥
পরাধীনে অবস্থান সম্ভব কি হয়।
নির্দ্ধনের মনোভাব হৃদয়ে বিলয় ॥
সেবকের কোপ বল কোন্ কার্য্যে লাগে।
ব্যভিচারিণীর পতি-প্রীতি কোথা থাকে ॥
মূর্খের সম্মতি লয়ে না করিবে কার্য্য।
কহিয়াছে কালিদাস এ নহে অন্যায্য ॥

শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

একজন প্রাতঃস্মরণীয় চিন্তাশীল কবি মানবজীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই, ভাবিয়া দেখিলে, পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দু যেমন ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর, মানবজীবনও তদ্রূপ বলিয়াই উপলব্ধি হয়। এই অসার ও ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে যিনি পরোপকারে স্বীয় জীবন উৎসর্গ ও অশেষপ্রকারে স্বদেশের হিতসাধন করিতে পারেন, সেই কীর্ত্তিবান পুরুষই চিরকাল অমর হইয়া জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকেন। প্রত্যেক পরিবারে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে ধাবিত হয়, এবং সকরুণ স্বরে তাঁহার কীর্ত্তি গান করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। আজ আমরা এইরূপ একজন কীর্ত্তিবান মহাপুরুষের পবিত্র জীবনী বর্ণনা করিব। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থায় এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে অকাতরে স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গের ইতিহাসে অতুলনীয় ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠক, তাঁহার এই জীবনীতে তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব হইলেও যাহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইল, তাহাতেই তাঁহার মহৎ চরিত্রের সম্যক্ লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবেক।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ ভবানীপুরে ১২৩১ সালে ইংরাজি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্ববাস—বর্দ্ধমান জেলার একটি গণ্ডগ্রামে ছিল। ভবানীপুরে বিবাহ করিয়া কুলীনদিগের চিরন্তন প্রথানুসারে তিনি শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। হরিশের জন্মের অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহার বাল্যশিক্ষার ভার তাঁহার মাতা ও মাতুলদের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা রুক্মিণী দেবী আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন, তাঁহার সুশিক্ষাতেই ভবিষ্যৎ জীবনে হরিশ তেজস্বী ও চরিত্রবান পুরুষ হইয়াছিলেন।

ভবানীপুরের গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতেই হরিশের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। কয়েক বৎসর পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজি শিক্ষা মানসে ইউনিয়ান স্কুলে প্রবেশ করেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অসাধারণ শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, সহধ্যায়ী পুত্রেরাও তাঁহার অকপট স্নেহ ও নির্ভিকতা দেখিয়া

তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অধ্যয়নে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও যত্ন ছিল, শুনিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁহাকে অধ্যয়ন সম্বন্ধীয় কখনও কোন প্রশ্নে নিরুত্তর করিতে পারেন নাই। এইরূপে শিক্ষক-মণ্ডলীর স্নেহ ও যত্নে তিনি সুশিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়া হরিশ পরিবার প্রতিপালন জন্য অনন্যোপায় হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, দৈনিক অন্ন সংস্থানের তাঁহার কোন উপায় ছিল না। এইরূপে কিছুদিন কার্য্যের অন্বেষণে অতিবাহিত করিলা তিনি টাকা কোম্পানির আফিসে একটি সামান্য কেরাণীপদে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে তাঁহার অভাবের লাঘব না হওয়ায় পরে সৈনিকদিগের ব্যয়ের হিসাব নির্দ্ধারক আফিসে একটি কেরাণীপদে নিযুক্ত হন, এই কর্ম্মেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে সমধিক উন্নতি লাভ হইয়াছিল। এই আফিসের প্রধান সাহেবেরা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং গুণের পুরস্কার স্বরূপ শেষে সহকারী অডিটরের পদে উন্নতি করিয়া দিয়াছিলেন। এই পদে তিনি মাসিক ৪০০ টাকা বেতন পাইতেন। এই আফিসে কার্য্যকালে হরিশ ঐ আফিসের সকলেরই বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এবং তাহাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার উৰ্দ্ধতন সাহেবদিগের প্রতিও তিনি কখনও যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

হরিশের আত্মসম্মানজ্ঞান যথেষ্ট ছিল। কোন বিষয়ে নিজের মর্য্যাদার কিছুমাত্র অসম্মান হইলে তিনি বিশেষ অপমানিত বোধ করিতেন। একবার তাঁহাদের আফিসের কোন সাহেব হরিশকে তাচ্ছিল্যভাবে একটি কথা প্রয়োগ করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে কর্ম্মত্যাগপত্র প্রদান করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলেন। তৎপর আফিসের বড় সাহেব এই কথা শুনিয়া অনুনয়বিনয়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় কর্ম্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এরূপ তেজস্বিতা বাঙ্গালীজীবনে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে আমরা এইরূপ আত্মসম্মানের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি।

"হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রিকাই হরিশ্চন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি হিন্দুপেট্রিয়টের

সম্পাদক ছিলেন এবং শেষে সত্বাধিকারীও হইয়াছিলেন। এই পত্রিকাই সেই সময়ে বঙ্গদেশের মুখপত্র ছিল, দেশের অভাব অভিযোগের কথা প্রকৃতরূপে রীতিমতভাবে লিখিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তদ্‌কালে এত ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ছিল না এবং ইংরাজী শিক্ষিত লোকও অতি অল্পই ছিল। সেইজন্য পেট্রিয়টের সমস্ত প্রবন্ধাদিই তাঁহাকে একাকী লিখিতে হইত। সিপাহী-বিদ্রোহ ও নীল হাঙ্গামার সময়ে হরিশ্চন্দ্র দেশের পক্ষ সমর্থন করিয়া যেরূপ তেজস্বিতা ও নির্ভিকতার সহিত পেট্রিয়টে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, সেরূপ বহুগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ অতি অল্পই লেখনীপ্রসূত হইতে দেখা যায়। তাঁহার এই সকল বহুমূল্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বড়লাট মহামনা লর্ড ক্যানিং তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতি সপ্তাহেই পেট্রিয়ট পাঠ করিবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। রাজনৈতিক প্রবন্ধ পেট্রিয়টে যেরূপ সুদক্ষভাবে লিপিবদ্ধ হইত, তাহা পাঠে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ হরিশের সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" যেরূপ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইত, অধুনা অতি অল্পমাত্র পত্রিকাই সেরূপভাবে পরিচালিত হইতে দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

সোহাগিনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশাগমন।

কাল কাহারও অপেক্ষা করে না, দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। হিন্দুর উৎসবামোদের পবিত্র সময় শুভ আশ্বিন মাস সমাগত, দুর্গোৎসবের মহতী ঘটা আরম্ভ হইল, হিন্দুর হৃদয় নাচিয়া উঠিল। এ সময়ের তুল্য আনন্দ হিন্দুর আর নাই,—এ সময় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অতি দীনহীন হইলেও এ উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করিবে, আনন্দময়ীর আগমনে কেহই নিরানন্দে থাকিবে না;—এই বহুদিনব্যাপী উৎসবে অবকাশ পাইবে, প্রবাসী প্রবাস ছাড়িয়া স্বদেশে আসিবে,—জননী জন্মভূমি দর্শন ও বন্ধুবান্ধবগণের আদর অভ্যর্থনায় চরিতার্থ হইবে, যাহার যেরূপ অবস্থা, সে সেইরূপেই আপন পরিবারের মধ্যে আনন্দ উৎসব করিবে। এ চিরপ্রথা হিন্দু ছাড়িতে পারে না।

পূজা সমাগত দেখিয়া ভবতারণ বাবু বাটী আসিবার মনস্থ করিলেন, বাটী না আসিলে মনোরমার বিবাহের কোনও উপায় হইবে না, বিশেষতঃ ভবতারিণী ও বিজয়া এই অবকাশে একবার স্বদেশে আসিয়া সকলে একত্র মিলিত হইবেন—ইহা তাঁহাদের বড়ই ইচ্ছা, এই উভয়বিধ কারণে কাজেই ভবতারণ বাবু আয়োজন করিতে তৎপর হইলেন। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে এবং মনোরমাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

পূর্ব্বে আমাদের কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভাগিনের ভাগিনেয়ী প্রতিপালনের একটা নিয়ম ছিল, প্রায়ই কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে ঐরূপ একটী না একটীকে প্রতিপালন করিতেই হইত। যত দিন যাইতেছে, যত আমাদের অবস্থাবৈগুণ্য হইতেছে,—ততই আমরা এ সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ হইতেছি। তাহার কারণ একমাত্র অর্থাভাব। এখন সামান্য বেতনেই আমাদের উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তখন আমাদের মধ্যে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান প্রায় সকলেরই থাকিত। এখন আমরা সভ্য হইয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিতেছি, যাহাতে অন্নের সংস্থান হয়, তাহা আমরা করি না বরং পৈতৃক চাষ-বাস যাহা আছে, তাহার উন্নতি করা পরের কথা, তাহাকে আমরা একটা সামান্য নিকৃষ্ট কাজ মনে করিয়া ঔদাস্য প্রকাশ করি। পল্লীজীবন যে অতীব সুখকর, সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের লোক যে সুখে কালযাপন করে,—তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু এখন সেই সুখের নিদান পল্লীগাম ছাড়িয়া সকলেই সহরে আসিয়া বাস করিবার জন্য ব্যাকুল কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, পল্লীগ্রামের সমান্য গৃহস্থ যেরূপ সুখে কালাতিপাত করে, সহরে বড়লোকেরাও সেরূপ সুখে কাটাইতে পারে না। পল্লীগ্রামে সামান্য গৃহস্থের বাটীতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অভুক্ত অতিথি যাইলে—তাহারা যেরূপ যত্ন করিয়া তাহাদের পরিতোষ করিতে পারে, শত মুদ্রাবেতনভোগী একজন সহরবাসীর সে ক্ষমতা নাই। এই জন্যই পূর্ব্বে লোকে আত্মীয় স্বজনকে এবং আগত অভ্যাগতকে গৃহে রাখিয়া অন্নদান করিত। হায়! কি ছিল আর কি হইয়াছে! অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানক্ষেত্র আজ অন্নহীন, নিজেই খাইতে পায় না, তা অপরকে পোষণ করিবে কিসে?

ভবতারণ বাবু যদিও এলাহাবাদে চাকরী করিতেন, যদিও তাঁহার আয় অতি অল্প ছিল, তথাপি স্বগ্রামে তাঁহার খাওয়া পরার কোনও কষ্ট ছিল না—এই জন্য তিনি উমাপতির মৃত্যুর পর ভগ্নী ও তাঁহার কন্যাকে নিজ আলয়ে

রাখিতে কোনও কষ্ট অনুভব করেন নাই। ভবতারণ বাবু স্বধর্ম্মনিরত হিন্দু ছিলেন অর্থাৎ তিনি অধিকাংশ সময় ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া, ততদূর আর্থিক উন্নতি করিতে পারেন নাই।

পূজার সময় বাটী আসিতে হইবে—মনোরমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই কারণে তিনি কিছুদিন অবসর লইয়া বাটী আসিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভালবাসি।

(১)

ভালবাসি প্রভাতের
নিরমল সমীরণ,
যারে সেবে প্রাণ মোর
শান্ত থাকে অনুক্ষণ।

(২)

ভালবাসি পূর্ব্বাকাশে
নবোদিত দিবাকর,
লোহিত বরণ শোভে
আহা কিবা মনোহর।

(৩)

ভালবাসি কোকিলের
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহুতান,
বিরহির শুনে যাতে
আকুলিত হয় প্রাণ।

(৪)

ভালবাসি ক্ষণতরে
কুসুমের চারুহাসি,
মধুপ গুঞ্জরি যবে
তদুপরে বসে আসি।

(৫)

আর ভালবাসি সেই
সুনীলে গগনে চাঁদ,
হাসি হাসি ফুল্লমনে
পাতে যাব রূপফাঁদ।

(৬)

ভালবাসি প্রণয়ের
সুখমাল্য বিনিময়,
বরবধূ দুইজনে—
সেই শুভ পরিণয়।

(৭)

ভালবাসি মৃদুহাসি
শিশুর অধরপুটে,
হেরিলে সে হাসিরাশি
শত দুঃখ যায় ছুটে।

(৮)

বিভুনাম ভালবাসি
হৃদে জপি বার বার,
অন্তিমে করিবে যিনি
মোরে ভবনদী পার।

শ্রীললিতা



লুকো-চুরি উপন্যাসের ছবির নমুনা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপহার।—আমরা ১৩১১ সালের আলোচনার গ্রাহকগণকে একটী উত্তম সময়রক্ষক সুবৃহৎ টাইমপিস ঘড়ি উপহার দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। যাঁহারা আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই বিশ্ববিমোহন উপহার পাইবেন। চৈত্র মাসের পর আমরা আর কাহাকেও উপহার দিতে পারিব না, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে। গ্রাহকগণ এ সুবিধা ছাড়িবেন না। আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ও ঘড়ি পাঠাইবার প্যাকিং, রেজেষ্টারী খরচ বাবদ ৷৵০ আনা সত্বর পাঠাইয়া উপহার গ্রহণ করুন।

হিলিংবাম।—আমাদের জনৈক কর্ম্মচারী বহুদিন হইতে প্রমেহ রোগে ভুগিয়া, নানাবিধ চিকিৎসায় কোন ফলপ্রাপ্ত না হইয়া, জীবনে এক প্রকার হতাশ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি মেসার্স আর লগিন এণ্ড কোম্পানীর "হিলিংবাম" সেবনে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। পেটেণ্ট ঔষধে যে এত শীঘ্র এরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না; "হিলিংবাম" ব্যবহার করিয়া আমাদের সে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইহা যে মেহ, প্রমেহ প্রভৃতির মহৌষধ, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রমেহ পীড়াক্রান্ত রোগীগণকে আমরা ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে সেবন করিতে অনুরোধ করি। মেসার্স আর. লগিন এণ্ড কোম্পানীর সুযোগ্য ম্যানেজার বাবু পাঁচকড়ি দত্ত মহাশয় রোগীগণকে বিশেষ যত্ন করিয়া ঔষধ প্রদান করেন। তাঁহার মত মিষ্টভাষী কর্ত্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোকের তত্বাবধানে কার্য্য চলিলে শীঘ্র কোম্পানীর উন্নতি হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রাপ্তি-স্বীকার।—আমরা নববর্ষ উপলক্ষে যে সকল দ্রব্য উপহার পাইয়াছি, নিম্নে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা করিলাম। নূতন চিনাবাজারের মেসার্স ব্রাক মিত্র এণ্ড কোম্পানীর সুরঞ্জিত চিত্র সহ এলম্যানাক; ইহাতে একটী ইংরাজ বালিকা যোড়করে ভগবানের উপাসনায় মগ্ন; চিত্রখানি

গৃহে রাখিবার উপযুক্ত হইয়াছে। পুরাতন চিনাবাজারের মেসার্স মতিলাল সুর এণ্ড কোম্পানীর একখান ডাইরী ও একখানি শ্রীমূর্ত্তি। ডাইরীখানি বাজারে বিক্রীত ডাইরী অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে; ইহাতে সাংসারিক সকল বিষয় লিখিবার প্রচুর স্থান আছে; লক্ষ্মীমূর্ত্তিখানিও বেশ নয়নমনোহর হইয়াছে। বোনফিল্ডস্ লেনের মেসার্স এন, পি, দত্ত এণ্ড সন্স দ্বারা প্রকাশিত সুবৃহৎ এলম্যানাক। ইহাতে একটী ইংরাজ রমণীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। চিত্রণ কার্য্য বেশ সুন্দর ও গৃহসজ্জার উপযুক্ত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ প্রচার।

(৫ম বর্ষের ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

ঈশ্বরের অনন্ত ভাব, অনন্ত ব্যাপার, অনন্ত কাণ্ডকারখানা ইত্যাদি যাঁহারা বোঝেন, তাঁহারা কখন বিবাদ করেন না। যাঁহারা তাহা না বোঝেন, তাঁহারাই ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, একদিন তিন চারটি অন্ধলোক হাতী দেখিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন হাতীর পায়ে হাত দিয়া আসিয়া বলিল, হাতী থামের মত। একজন হাতীর পেটে হাত দিয়া আসিয়া বলিল, হাতী জালার মত। একজন তাহার কাণে হাত দিয়া আসিয়া বলিল, হাতী কুলোর মত। আর একজন তাহার শুঁড়ে হাত দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হাতী লাঠির মত। এই মত লইয়া তাহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। তাহারা প্রত্যেকেই যে অন্ধ, তাহা তাহাদের জ্ঞান নাই। এমন সময়ে একজন চক্ষুবিশিষ্ট ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা কি লইয়া বিবাদ করিতেছ? তাঁহারা তাহাকে মধ্যস্থ করিয়া যে ব্যক্তি হাতীর যে প্রকার রূপ সাব্যস্থ করিয়াছে, তাহাই ব্যক্ত করিল। তখন তিনি বলিলেন, দেখ, তোমাদের কাহারই প্রকৃতরূপে হাতী দেখা হয় নাই। হাতী থামের মত নহে, তাহার পা থামের মত। হাতী জালার মত নহে, তাহার পেট জালার মত। হাতী কুলোর মত নহে, তাহার কাণ কুলোর মত। হাতী মোটা লাঠির মত নহে, তাহার শুঁড় মোটা লাঠির মত। ইহা ছাড়া হাতীর আরও কত কি আছে! তাহার মুখের দু'পাশ দিয়া বড় বড় দুটা দাঁত আছে, তাহার চক্ষু দুটি অতি ক্ষুদ্র, তাহার গায়ের বর্ণ ধূসর

ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমাদের কাহারও চক্ষু নাই, তথাচ বিবাদ করিতে ক্ষান্ত হও নাই। এই অন্ধদিগের ন্যায়, যাহারা ঈশ্বরের একদিক দেখেন, তাঁহারাই ঝগড়া বিবাদ তর্ক বিতর্ক করেন, যাঁহারা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের কোনওরূপ বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না।

অনেকে আছেন যে, তাঁহারা ভগবানকে কেবল আপন ভাবেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন, অপর যাহা কিছু ভাব আছে, তাহার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও হতশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এইরূপ ভাবকে গোঁড়ামী কহে। গোঁড়ামির পরিণাম যে কি প্রকার হইয়া থাকে, রামকৃষ্ণদেব একটী গল্প দ্বারা তাহা সাধারণকে কহিয়া গিয়াছেন। সেই গল্পটী এই—

"কোনও দেশে এক বিষ্ণুপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবের প্রতি তাঁহার বড়ই বিদ্বেষ ভাব ছিল। তিনি অতি কঠোর তপস্যা করায়, বিষ্ণু তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ হইয়া কহিলেন, দেখ, যদিও তুমি আমার প্রতি মহাশ্রদ্ধাবান কিন্তু শিবের প্রতি যতদিন তোমার দ্বেষ ভাব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি আমাকে লাভ করিয়া শান্তিভোগ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ যে হর—সেই আমি। ইষ্টদেবতার মুখে হর নাম শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণ দুই কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন ঠাকুর! ও নাম আমাকে শুনাইবেন না। পাছে ঐ নাম শুনিতে হয়, তাই নির্জ্জনে বাস করিয়া আমি আপনার আরাধনা করি। আপনার আশ্রয় ভিন্ন লোকে আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? বিষ্ণু এ কথায় বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় ঘোরতর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাধনবলে বিষ্ণু চঞ্চল হইয়া একাধারে হরহরিরূপে ব্রাহ্মণকে দর্শন দিলেন। ভক্ত এই প্রকার ভাব দেখিয়া, বিষ্ণুলক্ষণাক্রান্ত চরণটী জল দ্বারা ধৌত করিয়া দিলেন, তাহাতে চন্দন তুলসী ও পুষ্পাদি লইয়া অঞ্জলি প্রদান করিলেন, কিন্তু শিবলক্ষণাক্রান্ত চরণটী স্পর্শও করিলেন না। ধূনা প্রদানকালে শিবলক্ষণযুক্ত নাসিকাটী টিপিয়া ধরিলেন। ব্রাহ্মণের এবম্বিধ ব্যবহার দেখিয়া, বিষ্ণু ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, আমি তোকে দেবদুর্ল্লভ রূপ দেখাইলাম, তথাপি তোর শিবের প্রতি দ্বেষ গেল না। তোকে আর আমি কি বলিব, তোর বাসনা সিদ্ধ হইবে কিন্তু কখন প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারিবি না। এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়াও ব্রাহ্মণ শিবনিন্দা করিতে বিরত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁহাকে শিবনিন্দুক বলিয়া জানিতে পারিল। বালকেরা দল বাঁধিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া শিব শিব বলিয়া

হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। তিনি রাগান্বিত হইয়া ছুটাছুটি করিতে এবং তাহাদের জালায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাদের হাতে কোনও ক্রমে নিস্তার পাইলেন না। অতঃপর দুইটি কাণে দুইটী ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিলেন। যখনই বালকেরা শিব শিব বলিয়া চীৎকার করিত, তিনি মস্তক নাড়িয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতেন। পরিশেষে তাঁহাকে এইরূপে অনবরত মাথা নাড়িয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দিনযাপন করিতে হইত।” হায়! গোড়ামীর কি আক্ষেপজনক পরিণাম!

শুনিয়াছি, পরম বৈষ্ণব লালাবাবু যখন নৌকাযোগে কাশীর সম্মুখ দিয়া যান, সেই সময়ে তিনি নৌকার মাঝিকে কাশীর দিকের পর্দ্দা ফেলিয়া দিতে বলেন। কেন না, তিনি বৈষ্ণব, শিবতীর্থ দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। বৃন্দাবনে পাহাড় হইতে পড়িয়া লালাবাবুর অপঘাতে মৃত্যু হয়। অনেকে বলেন, কাশীর অবমাননা করাই ইহার একমাত্র কারণ।

তাই, অদ্য সকলকে বলিতেছি, যিনি যে ভাবে আছেন, যাহার যাহাতে বিশ্বাস আছে, তিনি ভগবানকে সেইভাবে লাভ করিবেন, সেইভাবে পাইবেন। কাহারও কথায় কেহ আপন ভাব পরিত্যাগ করিবেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, বাটীর স্ত্রীলোকে শ্বশুরের সেবা করে, ভাশুরকে ভাত দেয়, দেবরের অসুখ হইলে তাহার শুশ্রূষা করিয়া থাকে, পাড়ার লোকের বিপদ আপদে সাহায্য করে, কিন্তু স্বামীর নিকট ভিন্ন আর কাহারও নিকটে শয়ন করে না। সেই প্রকার প্রত্যেক ব্যক্তির আপন ইষ্টদেবতার প্রতি বা আপন ভাবের প্রতি স্বামীর ন্যায় জ্ঞান থাকা উচিত এবং অপরাপর ভাবকেও যথাবিহিত সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের মত অতি সামান্য ব্যক্ত করিলাম। তাঁহার উপদেশাদি সবিশেষ আলোচনা করিতে হইলে অনেক সময়ের প্রয়োজন; দুই এক কথায় বা দুই একদিনের কার্য্য নহে। সে সমস্ত যতদূর জানি, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল, যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সে সমস্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ভগবানকে দর্শন করা যায়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করা যায়, তাঁহার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করা যায় ইত্যাদি কথা, একেবারে বিশ্বাসই করেন না। তাঁহারা সে সমস্ত কথা বাতুলতা বা মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু বাস্তবিক

তাহা বাতুলতা নহে। ভগবানকে যে চায়, সে পায়, ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন। বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিলে তাহা উপলব্ধি করা যায়। জলকে যদ্যপি ক্রমান্বয়ে তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহা বাষ্পাকারে উড়িয়া ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায়। আর জলকে যদি ক্রমান্বয়ে শীতল করিতে চেষ্টা পাওয়া যায়, তাহা ক্রমে বরফের আকারে পরিণত হয়। বৃষ্টির সময়ে যে শিলা পড়ে, উহা আর কিছুই নয়, জলের জমাট অবস্থা মাত্র। বাষ্পের দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। যে স্থানে বাষ্প উড়িতেছে, হাঁ করিয়া দাড়াইয়া থাক, কিছুতেই তৃষ্ণা মিটিবে না। জলে তৃষ্ণা মেটে। আবার এই জল অপেক্ষা বরফের দ্বারা তৃষ্ণা অতি সত্বর সুচারুরূপে ও অল্পে মিটিয়া যায়। আমাদের ঈশ্বরপথেও সেই ভাব। জ্ঞানে ভগবানকে নিরাকার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, সেখানে তাঁহার রূপ নাই, গুণ নাই, কিছুই নাই। আবার ভক্তিতে তাঁহাকে সাকাররূপে সাধকেরা স্ব স্ব ভাবে দর্শন করিয়া তাঁহাদের জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। ভগবানের একটি নাম ভক্তাধীন। তিনি আর কখনও কাহারও অধীন হয়েন নাই। তিনি জ্ঞানীর অধীন নহেন, তিনি যোগীর অধীন নহেন, কিন্তু ভক্তের ভক্তিতে তাহার অধীন, তাহার আজ্ঞাকারী হইয়া যুগে যুগে কত লীলাই করিয়া থাকেন। জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি সকলে মুক্তি পাইয়া থাকেন কিন্তু ভক্তিধনে ধনী না হইলে ভগবানকে লইয়া সম্ভোগ করা যায় না। ভক্তির কারণে ভগবানকে পাতালে বলির দ্বারে দ্বারী হইতে হইয়াছে, বৃন্দাবনে নন্দের বাধা মাথায় করিয়া বহিয়াছেন, গোপগোপীর প্রেমে কাঁদিয়া দিন কাটাইয়াছেন। ভক্তি মানবজীবনের পরম সৌভাগ্য। ধন্য সে, যাহার এই ভক্তিলাভ হয়।

রামকৃষ্ণদেব ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া একটী গল্প করিতেন। কোনও পল্লী-গ্রামে এক দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ভগবতীকে বাৎসল্য-ভাবে আরাধনা করিতেন। ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ বয়সে একটী কন্যা হইয়াছিল। তিনি তাহার নাম ভগবতীর নামানুযায়ী সর্ব্বমঙ্গলা নাম রাখিয়াছিলেন। কন্যাটী রূপে ও গুণে সর্ব্ব সুলক্ষণা ছিল। তাহার রূপ গুণ দেখিয়া তথাকার জমীদার তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বড় লোকের যে প্রকার চাল-চলন, সেই অনুযায়ী তাহার শ্বশুর সর্ব্বমঙ্গলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে চাহিতেন না। যদ্যপি বিশেষ কারণ বশতঃ কখন পাঠাইতেন, তবে অধিক ক্ষণ তথায় থাকিতে দিতেন না। সর্ব্বমঙ্গলা ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া

তাহার মাকে বলিয়াছিল যে, মা, আর তোমরা আমাকে আনিতে পাঠাইও না। বাবা দীন দরিদ্র, আমাকে অতি কষ্টে খরচপত্র করিয়া আনিয়া যদ্যপি দুদিন না রাখিতে পান, তবে আমাকে আনিবার প্রয়োজন কি? এই কারণে সর্ব্বমঙ্গলা দুই তিন বৎসর আর পিত্রালয়ে আসে নাই। একদিন চণ্ডী পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের মনে হইল যে, এবারে পূজা করিতে হইবে। মা কি কেবল ধনীদের বাটীতেই যাইবেন, আর আমি গরীব বলিয়া আমার বাটীতে আসিবেন না? ধনীরাই কি মায়ের পুত্র, নির্ধনীরা কেহ নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল ক্রন্দন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, অদ্যাবধি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইব, তাহা জমাইয়াই মাকে এবারে আনিব। এই স্থির করিয়া, তিনি তদবধি তাহাই করিতে লাগিলেন। পূজা নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি ভাঁড়টী ঢালিয়া গণিয়া দেখিলেন, যে, প্রায় ৮৷৯টী টাকা জমিয়াছে। ব্রাহ্মণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি সেই মুহূর্ত্তে কুমোরের বাটীতে যাইয়া নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। কুমোর ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া বলিল, মহাশয় কি বাতুল হইয়াছেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, বাপু! মনে বড় সাধ হইয়াছে, মায়ের পদে গঙ্গাজল ও বিল্বদল প্রদান করিব, ইহাতে বেশী সঙ্গতির অপেক্ষা করে না। আমি দরিদ্র, তিনি দরিদ্রের মাতা, তিনি কি আমার প্রতি কৃপা করিবেন না? যাহা হউক, বাপু! তুমি আট আনার মত আমাকে একখানি প্রতিমা গড়িয়া দাও। কুমোর হাসিয়া বলিল, আট আনায় কি প্রতিমা হয়? তখন ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, মা! তবে কি কাঙালের গৃহে আসিবেন না? মা, আমি কি তোর কেহ নহি মা? মা, তুমি যে অনাথ অনাথিনীর জননী, তবে মা, এ অনাথার প্রতি কেন কৃপা করবি না মা? ইত্যাদি রূপ ক্রন্দন দেখিয়া, কুমোর একখানি প্রতিমা বিনামূল্যে দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহা হইবে না, তোমাকে মূল্যস্বরূপ কিছু লইতেই হইবে। পরে ঐ আট আনা লইয়া কুমোর একখানি সুন্দর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ আপন অবস্থানুযায়ী সমুদায় আয়োজন করিলেন। ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, সে জমিদারের বধূ, তাহাদের বাটীতে যে প্রকারের ধূমধামের পূজা, সেখানে যাইয়া আমি কি প্রকারে এ প্রস্তাব উত্থাপন করিব? ব্রাহ্মণী নিরুত্তর রহিলেন। পঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণ আপন

মনে দেবীর দিকে চাহিতেছেন আর কত কি বলিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমি অদ্য অস্পর্শীয়া হইয়াছি, কি করিয়া ঠাকুরের কার্য্য করিব? ব্রাহ্মণ এই কথা অশনি নিপাতাপেক্ষা অধিকতর কঠিন বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তিনি একাকী কি করিয়া সকল দিক রক্ষা করিবেন, ইহাই ভাবিয়া দিশেহারা হইলেন। তখন ব্রাহ্মণী কহিলেন, দেখ, আমাদের ত্রিকুলে কেহ নাই যে, আসিয়া সাহায্য করিবে, সুতরাং তুমি সর্ব্বমঙ্গলাকে আনিবার জন্য চেষ্টা কর। ব্রাহ্মণ তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণীর কথা সুপরামর্শজ্ঞান পূর্ব্বক সর্ব্বমঙ্গলাকে আনয়ন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বমঙ্গলার শ্বশুরকে অনুরোধ করায়, তিনি কহিলেন, আমার একটী বধূ, বাড়ীতে মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা হইবে, কত নাচ গান ইত্যাদি হইবে, আমি কেমন করিয়া তাহাকে পাঠাইব। বরং পাঁচজন ব্রাহ্মণ দিতেছি, লইয়া যাউন, তাঁহারা কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া আসিবে, যাহা খরচ পত্র পড়ে, আমি দিব। ব্রাহ্মণ লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া, ব্রাহ্মণ, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন। তিনিও কর্ত্তার ন্যায় আপত্তি করিলেন, সুতরাং সর্ব্বমঙ্গলার আসা হইল না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বশেষে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলেন। কন্যা, পিতার সমূহ বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ অগত্যা কন্যাকে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে কহিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কি করিয়া মায়ের পূজা হইবে, ইহাই ভাবিয়া আকুল হইলেন। কিছুদূর আসিয়াছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, পশ্চাৎ হইতে সর্ব্বমঙ্গলা 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ চাহিয়া দেখেন, সর্ব্বমঙ্গলা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ দাঁড়াইলেন। সর্ব্বমঙ্গলা নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, বাবা! আমি আসিয়াছি, আর তোমার ভাবনা কি? ব্রাহ্মণের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং আনন্দে নয়নাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া কহিলেন, বাছা, তুমি কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছ, মহাবিভ্রাট ঘটিবে যে। সর্ব্বমঙ্গলা হাসিয়া কহিল, বাবা! সেজন্য তোমার চিন্তা কি?

সর্ব্বমঙ্গলাকে বাটীতে আনিয়া ব্রাহ্মণ অতি আনন্দের সহিত জগতজননী সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিতে লাগিলেন। নবমীর দিন প্রাতঃকালে সর্ব্বমঙ্গলা

কহিল, বাবা, পূজায় না লোকজন খাওয়াইতে হয়? ব্রাহ্মণ কহিলেন, সত্য বটে; কিন্তু বাছা, আমি কোথায় কি পাইব? যদি মায়ের কৃপায় জীবিত থাকি, পর বৎসর তাহার আয়োজন করিব। সর্ব্বমঙ্গলা বলিল, বাবা, সেও কি হয়, যাহা মায়ের ভোগ হইবে, তাহাই সকলকে প্রসাদ দিব, আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসি। এই বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা পাড়ায় পাড়ায় যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। বেলা দুই প্রহরের সময় পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ জনতা দেখিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা হাসিয়া কহিল, বাবা, তোমার চিন্তা কি? আমি সকলকে মায়ের প্রসাদ খাওয়াইব। তুমি ব্রহ্মময়ীর সম্মুখে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তাঁহার চরণ-যুগল দর্শন করগে। বাবা! তোমার বাটীতে স্বয়ং ভগবতী বিরাজ করিতেছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবদিগকে আহার দিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে কি এই কয়টী লোকে আহার পাইবে না? বাবা, দেখ দেখি, তুমি দরিদ্র বলিয়া মাতা কি তোমার মনোসাধ অসম্পূর্ণ রাখিলেন? যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া পূজা করে, সেই ব্যক্তির যে পরিমাণে আনন্দলাভ হয়, তাহা অপেক্ষা তোমার কি আনন্দ কম হইয়াছে? আহা, দেখ দেখি! মাকে, তোমার প্রেমে এই তালপত্রের কুটীরে আসিতে হইয়াছে, তাঁহার স্থানাস্থানের অভিমান নাই। ভক্তি ক'রে তাঁহাকে যে যেখানে ডাকে, তিনি সেইখানে দৌড়িয়া আসেন। বাহিরের আড়ম্বরে কেহ তাঁহাকে আনিতে পারে না। অতএব বাবা, তুমি স্থির হও, আমি সকলকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইব। অতঃপর সর্ব্বমঙ্গলা বাহিরে আসিয়া সকলকে বিনীতভাবে কহিল, দেখুন, আমার পিতা দীনদরিদ্র, ভগবতীর পূজা করিবার তাঁহার অত্যন্ত বাসনা ছিল। সর্ব্বমঙ্গলা অভয়া সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলার শুভাগমনে এ স্থান পবিত্র হইয়াছে। আপনারা দয়া করিয়া আমার পিতাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহার কিছুতে ভক্তির ত্রুটী না হয়। আপনাদিগকে চাতুর্ব্বিধান্নে ভোজন করাইতে পারেন, তাঁহার এমন সামর্থ নাই। আপনারা মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়া, পিতাকে কৃতার্থ করিয়া যাউন। এই বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা প্রসাদ পাত্র বাহির করিলেন। প্রসাদ বাহির করিবামাত্র তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। যদিও কেহ কেহ প্রথমে সর্ব্বমঙ্গলার কথায় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রসাদের সুগন্ধে তাহারাও বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বমঙ্গলা কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদান করিয়া বাস্তবিক সকলের এরূপ পরিতোষ সাধন করিয়াছিলেন যে, সকলে হৃদয় খুলিয়া ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এতাবৎকাল ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়া একমনে দীন দয়াময়ীকে ডাকিতেছিলেন। যখন সর্ব্বমঙ্গলা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি কহিলেন, বাছা! ব্রাহ্মণেরা কি আমার অভিশাপ করিয়া গেল? সর্ব্বমঙ্গলা হাসিয়া কহিল, বাবা। এখনও তোমার ভ্রম যাইতেছে না। সম্মুখে মাতা উপস্থিত রহিয়াছেন, তিনিই তোমার কার্য্য করিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? এই দেখ, এখনও এত মহাপ্রসাদ রহিয়াছে যে, আরও শত শত লোককে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইতে পারি। সকলে তোমাকে হৃদয় খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে। শুনিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের অবধি রহিল না, তিনি ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, সর্ব্বমঙ্গলা জমীদারের ঘরে পড়িয়া অনেক কথা শিখিয়াছে, সে কেমন ন্যায়সঙ্গত কথা কহিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছে। আহা মা আমার। তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

দিগ্বিজয়ী গ্রন্থকার!!

ভো ভো বঙ্গবাসিগণ! ভো ভো স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ!! বলি, আমি যে একজন খাঁটি নূতন ধরণের দিগ্‌গজ গ্রন্থকার হ'য়েছি, তা কি ছাই তোমরা আজও শোননি!! আঃ তোমাদের কপাল!! আমি কাব্য-কূপ মন্থন ক'রে তোমাদের জন্য এক অভিনব অমৃতভাণ্ড উত্তোলন ক'রেছি,—হা দুর্ভাগ্যগণ! তোমরা তা একবার পান ক'রে দেখ্‌লে না? সাধ ক'রে এমন ধনে বঞ্চিত হ'লে? অহো কি পরিতাপ! হা বঙ্গবাসিগণ! তোমাদের জ্ঞানচক্ষু কি ফুটবে না? ভারত কি চিরদিন ঘুমায়ে রবে? বলি, তোমরা কি আমাকে আজও চিন্তে পারলে না? ভারতের লোকটা চিনে ফেললে, আর তোমরা পারলে না? মাতঃ বসুন্ধরে! দ্বিধা হও মা! তোমার গভীর গহ্বরে প্রবেশ ক'রে প্রাণের জ্বাল' দূর করি। মাগো! এ দুঃখ কেমনে সহ্য করি, আমার জন আমাকে চিন্‌তে পারলে না, এ দারুণ শক্তিশেল যন্ত্রণা কিসে নিবারণ করবো মা! তাই বলি, হে বঙ্গবাসিগণ! তোমরা আমাকে

চিন্‌তে চেষ্টা কর। ঐ দেখ, ভারতের জেলায় জেলায় আমার সুনাম বাহির হ'য়ে পড়েছে, যদিও সমস্ত জেলায় আমার নাম সুপ্রচারিত না দেখ্‌তে পাও, তবে বর্দ্ধমান জেলায় অনুসন্ধান করলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বে, আর যদি বর্দ্ধমানেও পূর্ণ মনোরথ না হও, তা' হলে ঐ জেলার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে একবার খোঁজ করতে হবে, নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, একখানি গ্রাম আমার সুনাম সৌরভে ভুর ভুর করছে। কিন্তু অগ্রে একটা কথা বলে রাখি, উক্ত গ্রামের সমস্ত অংশটা খুঁজে তোমাদের অনর্থক কষ্ট পেতে হবে না, সর্ব্বাগ্রে মুচি কিংবা হাড়ি পাড়ায় গিয়ে হাজির হবে, আমি শপথ ক'রে বলছি, সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে, আমার পসার প্রতিপত্তি একচেটে। যদি মুচি পাড়ায় আগে যাও, তবে ভিকে, দ্বারকে কিংবা হরে মুচিকে জিজ্ঞাসা করো, আর যদি—হাড়ি পাড়াটাতেই তোমার আগে যেতে ইচ্ছা হয়, তা হ'লে জানকে, (থুড়ি, সে বুঝি সম্প্রতি মারা গেছে।) রুটো, মগা, ক্ষুদিরাম নিমাই ইত্যাদি হাড়িকুল গৌরবগণকে জিজ্ঞাসা করো, আমি নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়ই বলছি, উহাঁদের মধ্যে যাঁ'কে জিজ্ঞাসা করবে, তাঁরাই অকুতোভয়ে আমার ভূয়ো ভূয়ো গুণ-কীর্ত্তন কর্‌বেন। সে দিন শ্রীমতী নানী-মুচিনী বল্‌ছিলেন, "হ্যাঁগো দাদাঠাকুর, তুমি না কি একটা মস্ত কপি হ'য়েছ; লোকে বল্‌ছে, এই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল, মৃতকল, ভূতকল, হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি জায়গায় তোমার নামে না কি খুব একটা ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে", তাই বলি, হে বঙ্গ বিবুধগণ! তোমরা আমার বুদ্ধির তাৎপর্য্যটা অনুভব কর। দুনিয়ার কত কুমুলক ছাই পাঁসগুলার জন্য তোমরা দুহাতে টাকা উড়িয়ে দিচ্ছ, আর আমার 'সু'নামাঙ্কিত সুরুচিপূর্ণ গ্রন্থরাজি ক্রয় ক'রবার জন্য তোমরা একটী পয়সা ব্যয় ক'রতে পার্‌ছো না। ধিক্ তোমাদের ধরমে, ধিক্ তোমাদের করমে, ধিক্ তোমাদের মরমে, আর শতধিক্ আমার লেখনী ধারণে!!!

যদিও আমি আমার পুস্তকের মূল্য যৎসামান্য ধার্য্য ক'রেছি, কিন্তু সেজন্য তোমাদের ভা'ববার কোন কারণ নাই। যদি তোমরা অনুগ্রহ ক'রে পাঠ ক'রবার অভিলাষ ব্যক্ত কর, আমি বিনামূল্যে বিনা মাশুলে, তোমাদের কাছে গ্রন্থ পাঠিয়ে দিব, অথবা, আমি স্বয়ং তোমাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া তোমাদের সুকোমল করকমলে এক এক কাপি বিতরণ ক'রে আস্‌বো। আমার গভীর গবেষণাপূর্ণ অমৃতময়ী কাব্যের প্রকৃত তত্ত্বোদ্ঘাটনে তোমাদের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক

অপটু হ'লে (যে হেতু প্রবাদ,—বাঙ্গালীজাতি চির দুর্ব্বল) আমি স্বয়ং পাঠ ক'রে তোমাদের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করে আসবো। দেখ দেখি, আমি তোমাদের জন্য কত কষ্ট করতে প্রস্তুত, আর, তোমরা দয়া ক'রে এই গরীব ব্রাহ্মণকে এই ভীষণ পিতৃমাতৃদায় হ'তে উদ্ধার ক'রবে না।

তোমরা যদি কৃপা ক'রে আমার কাব্যখানি পাঠ কর, তা'হলে আমি চিরদিন ত বটেই, অধিক কি, আমার অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমাদের ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, তোমাদের এই সদ্ব্যবহারের জন্য আমি তোমাদের গো মেষ চরাতে কিংবা মূল মূত্র ছাপ করতেও রাজি আছি, আর ইহাও দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, যে আমার গ্রন্থ পাঠের পর যদি, তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে তৎপুরস্কার স্বরূপ আমার নাক কাণ কেটে এবং মাথা মুড়ায়ে তা'তে ঘোল নামক তরল পদার্থ ঢেলে আমাকে ভূভারত ছাড়া করে দিতে চা'ও, তা'তেও আপত্তি নাই। অতএব হে স্বদেশবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! আমার এই কাতরোক্তি শ্রবণে তোমাদের পাষাণ প্রাণে কি একবিন্দুও দয়ার কণা বাহির হ'বে না? হে ভক্তগণবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভূতভাবন ভোলানাথ! এই ভৃত্যাধমের বাঞ্ছা কি পূরণ করবে না? হে সুরেশ্বর সহস্র ভগনাশন! শ্রীমধুসূদন আমার স্বদেশবাসিগণকে সুমতি দাও প্রভো! যেন তারা আপন রতন চিনে লয়।

দেখ বন্ধুগণ! আমি তোমাদের জন্য কি অমূল্য ধন আবিষ্কার ক'রেছি। হেমচন্দ্র ভারত কামিনীর জন্য কত কেঁদেছিলেন, তা' বোধ করি তোমরা শুনে থাকবে, আর আমি "ভারত ললনার" জন্য কি প্রকারে বুক ভাসাচ্ছি, একবার দেখে লও। এই দেখ, "ভারত ললনা" "ভারত ললনা" করে কেঁদে কেঁদে আমার একটী চক্ষে ছানি পড়বার উপক্রম হ'য়েছে।! হেমচন্দ্রের 'ভারতকামিনী' লেখার পরই, আমার এই অভিনব "ভারত ললনা" কাব্য বাহির হয়; ভারত ললনা" বাহির হওয়ার পরই আমি সসম্মানে "হস্তীমূর্খ" উপাধি অর্জ্জন করি। আমার ভাষার ঘটায় এবং ভাবের ছটায় মোহিত হ'য়ে লোকে আমাকে নিশ্চয়ই এই উপাধীরত্ন প্রদান করে থাক্‌বে। কিন্তু আর একটী বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে, হেমচন্দ্র অপেক্ষা আমার কলেবরটা স্থূল না হ'লেও বুদ্ধিটা অসাধারণ বটে, অপিচ, আমার কলেবর অপেক্ষা আমার নয়ন-কমল দুটী স্বভাবতই কিছু ক্ষুদ্র, বোধ হয় এই দুইটী শুভকারণেই আমার উক্ত উপাধী লাভ হ'য়ে থাক্‌বে।

এক্ষণে হে মহোদয়বৃন্দ! আমি গললগ্নীকৃতবাসে তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমরা অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই অভিনব গ্রন্থকারের অভিনব কাব্য গ্রন্থ পাঠ ক'রে আমাকে ধন্য কর। আমার কত সাধের "ভারত ললনা" আর কতদিন ভাগাড়ে পড়ে ভেড়েণ্ডা ভাজবে! তোমরা জহুরি হও, প্রকৃত রত্নের আদর করতে শিখ।

তোমাদের উৎসাহ পেলে, আমি ভরতললনা অপেক্ষাও অনেক অমূল্য কহিনূর তোমাদের করে চিরদুঃখিনী হতভাগিনী বঙ্গভাষাকে একেবারে ধনশালিনী ও সৌভাগ্যশালিনী করে দিব। সংপ্রতি আমি ভারতললনা 'কাদম্বরী'কে বাহির ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছি। "মার্কণ্ডেয়ের গণ্ডির ভিতর থেকে থেকে অভাগিনীর দুনয়ন পিঁচুটী পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, আমার হাতে প'ড়ে তার কত রূপ ফুটেছে, আরও কত কি হ'য়েছে, তা' লিখে কি জানাব, সাধারণ সমক্ষে বাহির হ'লেই টের পাবে।

'কাদম্বরী'কে সুসজ্জিতা করবার জন্য আমি চুরি করতেও কসুর করিনি। তোমরা দেখলেই বুঝবে, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, যদুগোপাল, তারাশঙ্কর প্রভৃতির সার সম্পত্তিগুলি বেমালুম 'কোট' ক'রে কেমন জোট লাগিয়ে দিয়েছি। কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর নিকট আমার 'কাদম্বরী'কে কিছুদিনের জন্য রেখেছিলাম, কিন্তু তারা এমনি অরসিক, যে আমার হাবভাবশালিনী কাদম্বরীর মধুপানে মাতোয়ারা হ'য়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গটা ছিঁড়ে কেটে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। আমার কত কষ্টের চোরা অলঙ্কারগুলি, থুড়ি—আমার আপন হাতে গড়া নিখাদ অলঙ্কারগুলি, বহুল পরিমাণে খুলে নিয়েছে!! তা' যাক, এতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি, (যে হেতু 'কাদম্বরী'টা আমার আগাগোড়াই 'কোট' করা) আমি তা'কে এবার এই আহ্লাদেই জাহির করবো। আমি শপথ করে বলছি, আমার 'কাদম্বরী'কে প্রাপ্ত হ'লে, তোমরা নিশ্চয়ই বিমোহিত হ'য়ে যাবে।

এতদ্ভিন্ন, আমার আরও একটী কাব্যকমল খনির তিমির-গর্ভনিহিত রত্নবৎ লোকলোচনের অগোচর রয়েছে। ঐ কমলে এত মধু ঢেলেছি, যে পাঠকগণ আজীবন পান ক'রেও ফুরাতে পারবে না। আমার এই কমলের মধুপান না করেই কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভদ্রলোক অযাচিতভাবে সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন,—না না—তাঁরা নিজ হাতে লিখবেন কেন, আমিই স্বহস্তে তাঁ'দের নাম সম্বলিত সুখ্যাতি পত্রগুলি আমার মনের মত করে

লিখে কমলের কোমল কলেবরে যোজনা ক'রেছি, আমার কমল প্রস্ফুটিত বা প্রকাশিত হ'লেই সাধাবণে তা' দেখ্‌তে পাবেন। অতএব হে স্বদেশ-বাসিগণ! তোমরা দয়াপরবশ হ'য়ে আমার উৎসাহবর্দ্ধন কর, তোমাদের উৎসাহ পেলে আমাব দ্বারা দুর্ভাগিনী বঙ্গভাষার প্রভূত পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হ'বে, ইহা সর্ব্ববাদী সত্য। আব তোমাদের তুষ্টিসাধন জন্য আমি সব কোরতে প্রস্তুত আছি। চুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, ফক্কুরি, সব কর্‌বো।

আব একটী কথা এইখানে বলে রাখি, আমি খুব রসিকতাপ্রিয়, এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ফক্কুরি বা রসিকতার অনুরোধে আমি না কর্‌তে পারি কি! শ্বশুব শাশুড়ী, জামাই বেহাই, পুত্র পুত্রী, শালা শালী, মাতা মাতামহী, পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে সমশ্রেণীতে দাঁড় ক'রায়ে তোমরা যেমন তামাসা দেখ্‌তে ইচ্ছা কর, আমি তাই দেখাব! আমার রসিকতার চাতুর্য্য দেখে আমাদের গ্রামের লোক আমাকে 'রসিকরাজ' উপাধী অর্পণ করেছেন। আমার উপাধীর কথা এতদিন স্বগ্রামেই বাষ্ট্র ছিল, এইবার দেশবিদেশে প্রচার করে বাহবা লাভ কর্‌বো। উপসংহাবে প্রার্থনা এই যে, তোমরা মোটের মাথায় আমার সমস্ত গুণেরই পরিচয় পেলে। আর, আমি যে 'হস্তীমূর্খ রসিকরাজ' উপাধীধাবী হ'য়েছি, এ কথা বোধ হয়, তোমাদের স্মরণ থাক্‌বে, অলমিতি। শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।



বীণাপাণি।

(১)

হে মাতঃ ভারতী দেবী অমৃতভাষিণি!
শ্বেতাঙ্গিনি, সরোজবাসিনি শুভঙ্করি!
কবিকুল-মানস-মন্দির-সুশোভিনি!
জাগ মা হৃদিসরোজে, হেরি নেত্রভরি।

(২)

করে ধরি স্বর্ণবীণা, দাও মা ঝঙ্কার ;
মাতুক হৃদয় মম, সে মধুর স্বরে।
বাজাও বাজাও বীণা ঘুমাও না আর,
শিখাও বাজনা দাসে ধরি মা স্বকরে।

(৩)

হেলায় কাটানু কাল জন্মি এ সংসারে ;
বৃথা কার্য্যে দিবানিশি করিলাম ক্ষয়।
ধিক্ এ জনক মম ভারত-মাঝারে ;
ধিক্ মোরে ! না লইনু তব পদাশ্রয়।

(৪)

পূজিতে ও পদ মাতঃ ! করেছি বাসনা ;
কিন্তু কিছু নাই, তব যোগ্য উপচার।
কি দিয়া সাজাব পদ, বৃথা এ কামনা ;
অতি নিঃস্ব কোথা পাব হেন অলঙ্কার ?

(৫)

করুণা-নয়নে সতি ! চাও অভাজনে ;
দয়াবতি ! তুমি মাগো তিমিরনাশিনী।
জ্ঞান-দীপ জ্বালি হৃদে, কৃপা বিতরণে ;
অজ্ঞান আঁধারে তার বিশ্ববিনোদিনি !

(৬)

যে পদ সেবেন কবিগণ সমাদরে,
হেন পদ না সেবিনু আমি মূঢ়মতি।
ক্ষম দোষ দাসে মাতঃ ! ডাকি সকাতরে,
গতিহীন জনে দয়া, কর মা সম্প্রতি।

(৭)

ব্রহ্মলোক সুশোভিনি, শশধরাননে !
বিশ্বরমে, অষ্টাদশবিদ্যা প্রসবিনি !
না জানি মা তব স্তুতি, এই অকিঞ্চনে ;
শিখাও, বর্ণিতে ভাষা হে দীনতারিণি।

(৮)

দেহ বর দাসে দেবি! পুরাও বাসনা,
কবিত্ব অমৃত-রস বিতর গো সতি!
পিয়ে সেই সুধারস করি গো বর্ণনা
নবোৎসাহে স্বভাবের মোহন মূরতি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

সমালোচনা।

আলোচনা সমিতির প্রধানতম উদ্দেশ্য—বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা ও পুষ্টিসাধন; এবং "আলোচনা" সমিতির মুখপত্র, ইহাতে সেই সকল সমালোচনা ও মন্তব্য প্রতি মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। আজিকালি বিজ্ঞাপনরূপ ঢাঁকের গগনবিদারি-শব্দে পাঠকের কর্ণ বধির,—যাঁহার 'হাম্‌বড়া' বোল যত অধিক, যাঁহার বিজ্ঞাপন-কুহকে আত্মপ্রশংসা যত প্রবল, তিনিই বঙ্গের উদীয়মান লেখক। এই সকল গ্রন্থকারের প্রবল অত্যাচারে সরস্বতী পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছেন। আর পাঠকগণ বিজ্ঞাপনের ঘট-টঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া কাঞ্চনমূল্যে কাচ ক্রয় করিয়া হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, যাঁহারা সদ্‌গ্রন্থকার—যাঁহারা যথার্থ মাতৃভাষার সেবক,—যাঁহাদের লেখায় ভাব আছে, ভাষায় মধুরতা আছে, সাহিত্যে জ্ঞান আছে,—তাঁহারা পাঠকের উৎসাহ অভাবে ম্রিয়মান ও অবসন্ন। 'ঠেঁটা ঢাকের বাদ্দি বড়'—'অকর্ম্মা নাপিতের ভাঁ'ড় মোটা'—ইহা যথার্থই। কোন সংবাদ-পত্র বা কোন সমালোচক কোন দিন বলে নাই, অমুক একমাত্র বিখ্যাত গ্রন্থকার, কিন্তু অপদার্থ গ্রন্থকারের দল, নিজেই ঢাক ঘাড়ে করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে,—বিখ্যাত লেখক অমুক—কিন্তু যাঁহাদের কিছু আছে, তাঁহারা ইহা কখনই পারেন না, আত্মপ্রশংসায় তাঁহাদের কুণ্ঠা হয়, কাজেই তাঁহাদিগকে আসর ছাড়িতে হইতেছে। আবার আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকারের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহারা পরের নকল করিয়া গ্রন্থকার। নিজের কল্পনাশক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও বিকাশ নাই,—আদালতের রায়ের মত, পুলিস রিপোর্টের মত অনুবাদ করিয়া সেই পুস্তকের তিনি হইলেন প্রণেতা। তার

উপরে বিখ্যাত গ্রন্থকার! ঐ সকল দায়ীত্ববিহীন ব্যক্তির জ্বালাতেই ত এত বিভ্রাট! তাহারা যদি অনুবাদিত ও অনুবাদক শব্দ ব্যবহার করিত, তবে কাহারই আপত্তি থাকিত না। আমরা এখন হইতে সাহিত্যের ঐ সকল গলদ দেখাইতে বিধিমতে চেষ্টা করিব। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধানার্থ—সাধারণ পাঠকের মঙ্গলার্থ যে সকল পুস্তকের বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বাহির হইবে, আমরা তাহা খরিদ করিয়া ইহাতে সমালোচনা করিব, তাহা হইলে পাঠক ভাল মন্দ পুস্তক বাছিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন। অধিকন্তু আলোচনার প্রত্যেক গ্রাহকই সমিতির মেম্বর, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন বাঙ্গালা পুস্তক সম্বন্ধে মতামত এই কাগজে লিখিতে পারিবেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া, বন্ধুত্ব ভালবাসা বা বিদ্বেষভাব ভুলিয়া কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধানার্থ এইরূপ সমালোচনার অবতারণা করা হইবে।

লুকো-চুরি।—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর, মূল্য ১॥• দেড় টাকা। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

সাহিত্য-বিপ্লবের মধ্যে—মৃণাল-জাল-জটিল সাহিত্য-সরোবরে লুকোচুরি উপন্যাস মধ্যাহ্নের কমল। এই গ্রন্থে অনেকগুলি নরনারীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, অনেকগুলি ভাবের আভাস অঙ্কিত হইয়াছে। প্রেমের সকল প্রকার ছবিই আছে—কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর লেখার একটু মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্য্যত্ব এই যে, সর্ব্বত্রই সমান দক্ষতা। নরনারীর চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতির ভাব-বৈচিত্র, আর জাতীয় জীবন ও নিষ্কাম কর্ম্মভাবের আদর্শ ইহাতে অতি উজ্জলতর—স্পষ্টতর ভাবে লিখিত হইয়াছে। ভাষা সেই মদ-বিহ্বল, সেই সর্ব্বত্র সমীচীন ও মধুর। প্রত্যেক পাঠককে আমরা লুকোচুরি উপন্যাসের অভিনবত্ব অনুভব করিতে অনুরোধ করি। এমন ঘটনা-প্রহেলিকা, ভাব-বৈচিত্র, ভাষার বাঁধুনী অল্প পুস্তকেই আছে। সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি ছবি আছে। একখানি ছবি আমরা আলোচনার পাঠকের দৃষ্টির জন্য স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আগামী বর্ষের উপহার।—আমরা ১৩১১ সালের আলোচনার গ্রাহকগণের জন্য বিশ্বমোহন উপহারের বন্দোবস্ত করিয়াছি, এরূপ উপহার পূর্ব্বে কেহ কখন দিতে পারেন নাই। যাঁহারা আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে আলোচনার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের সকলকে এক একটী সুন্দর সুবৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট সময় রক্ষক টাইমপিস ঘড়ি উপহার দিব; প্যাকীং ও রেজেষ্ট্রী খরচ বাবদ অতিরিক্ত ।৶০ আনা গ্রাহকদিগকে দিতে হইবে, অর্থাৎ মোট ২৷৶০ আনা আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে পাঠাইলে সকলেই আমাদের এই বিশ্ববিমোহন উপহার পাইবেন। উপহার সংখ্যা অল্প বলিয়া সকলকেই সময় থাকিতে টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করি, নতুবা নৈরাশ হইবার সম্ভাবনা।

কবিরাজের কথা।—কুমারটুলির কবিরাজ-বংশ চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। অধুনা বঙ্গদেশে কবিরাজি চিকিৎসার উন্নতি কেবল তাঁহাদেরই দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। মৃতমহাত্মা গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় অতি বৃদ্ধ হইলেও বঙ্গদেশ কবিরাজী চিকিৎসায় এখন তাঁহার মুখাপেক্ষী। তদীয় কৃতীপুত্র পুণ্যাত্মা শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ও জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নিকট রীতিমতরূপে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া অধুনা চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ গুণপনা দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, কালে ইনি বংশমর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারিবেন। কবিরাজ নিশিকান্ত সেন অতি নম্র প্রকৃতি, মিষ্টভাষী এবং সর্ব্বাংশেই পিতৃপথানুবর্ত্তী। ভগবান পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের এবং দশের মঙ্গল সাধনার্থ ব্রতী করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ।—কলিকাতা গুপ্তবংশের অন্যতম যুবক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কলিকাতা ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে "আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স" নাম দিয়া একটী ঔষধের কারবার খুলিয়াছেন। এই ঔষধালয়ে সকল প্রকার ডাক্তারী ঔষধ খুচরা ও পাইকারী দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। Honesty is the best policy এই মহৎ বাক্যের অনুসরণ করিয়া সম্প্রতি উক্ত কোম্পানী ঔষধ বিক্রয় বিষয়ে কলিকাতার বাজারে সামান্য দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। স্বর্গীয় পিতার ঔষধের ন্যায় ইহাঁদের "ফেব্রিণা" ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। আমরা ইহার দ্বারা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীগণকে সামান্য দিনের মধ্যে আশাতীত ফল লাভ করিতে দেখিয়াছি। ইহার ঔষধালয়ের ঔষধ সকল টাট্কা এবং বিলাতের প্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতাগণের নিকট হইতে আনীত। মূল্য অপরাপর দোকান অপেক্ষা অতীব সুলভ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাঁদের উন্নতি কামনা করি।

গোলাপ নির্য্যাস।—আমরা সেক ফসিউল্লা কৃত এক শিশি গোলাপ নির্য্যাস উপহার পাইয়া পরীক্ষা করিয়াছি, ইহার গন্ধ অতি মনোহর এবং চক্ষুরোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাজারে সামান্য মূল্যের স্বাস্থ্যনষ্টকর গোলাপ জল ব্যবহার করা অপেক্ষা সেখ ফসিউল্লার কৃত "গোলাপ নির্য্যাস" ব্যবহার করা যে সহস্রগুণে শ্রেয়, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

এলম্যানাক ও হিন্দু দেবদেবীর ছবি।—বিখ্যাত চোরবাগান আর্টষ্টুডিও হইতে আমরা কয়েকখানি চিত্র উপহার পাইয়াছি। চিত্রগুলি গৃহসজ্জার বিশেষরূপ উপযোগী হইয়াছে। আমাদের দেশের মধ্যে আধুনিক চিত্রশিল্পে চোরবাগান আর্টষ্টুডিও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহাঁরা উপস্থিত ষ্টিম এনজিন ও অপরাপর মেশিন প্রভৃতি আনাইয়া যে কাজকর্ম্ম অতি সুন্দর সুবিধাদরে প্রস্তুত করিবেন, তাহা এই সমস্ত চিত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার [illegible] মহাশয়ও চিত্রকার্য্যে বিচক্ষণ, কারণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আধুনিক সুদূর বিলাতীর ন্যায় বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না, অক্ষয় বাবুর ন্যায় মিষ্টভাষী, কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের তত্ত্বাবধানে কার্য্য চলিলে চোরবাগান আর্টষ্টুডিও যে শীঘ্রই উন্নতি সাধন করিয়া বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভীষণ সমর।—জাপান ও রুষিয়ায় ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে, এত শীঘ্র যে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে, তাহা আমরা মনে করি নাই। আজ কাল যুদ্ধের সঠিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করা যায় না, তবে রয়টার প্রভৃতির টেলিগ্রামে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে জাপান সামান্য হইলেও যুদ্ধ বিষয়ে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন, জয় পরাজয় এক্ষণে ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহীত।

নূতন সংবাদপত্র।—আমরা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে নূতন প্রকাশিত একখানি "টেলিগ্রাম" নামক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিত পাইতেছি। ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র এত অল্পমূল্যে প্রদান করিয়া প্রকাশক মহাশয় বাস্তবিকই দেশের একটী অভাব দূর করিতেছেন; "টেলিগ্রামের" লিখন প্রণালী ও পরিচালন কার্য্য উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে, এক্ষণে সহযোগী দীর্ঘজীবী হইলে আমরা সুখী হইব।

বীণা।

প্রায় সপ্তদশ বৎসর পরে অতীতের স্মৃতিগুলি এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনের স্রোত বুঝি এইবার ভিন্নদিকে প্রবাহিত হইল। কিন্তু হায়, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। মানবের আশা এবং বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা একই সামগ্রী নহে বরং মনুষ্যের অদৃষ্ট ও বিধাতার ইচ্ছাকে একবস্তু বলা যাইলেও যাইতে পারে। মানব মনে মনে শত আশার সৃজন করে, তিনি তাহার সকলগুলি পূর্ণ হইতে দেন না।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন আমার হৃদয়ে মায়াবিনী আশা নূতন মুকুলিত হইতেছিল, যখন ভালবাসার মনুষ্যকে সুখের পরিবর্ত্তে সময় সময় দুঃখের তলহীন সাগরে নিমগ্ন করিতে পারে, ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল, তখন

আমি যেন বিকশিত প্রফুল্ল কমলিনীর মধুপানাশায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, বিশাল বারিধিগর্ভস্থিত ভয়াবহ জলজন্তু ও নানা প্রতিকূলতার উপেক্ষা করিয়া গভীর জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া অবশেষে কমলদলে আবদ্ধ হইয়া নিরাশপ্রাণে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখন কে জানিত যে, সেই দেবদুর্লভ স্বর্ণকমলদলনের ভার আমারই অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ আছে।

যাঁহাকে ভুলিবার জন্য, সকল স্বার্থ আশা ত্যাগ করিয়া অবশেষে দেশত্যাগী হইয়াছিলাম, আবার যে সপ্তদশ বৎসর পরে মুহূর্ত্তের তরে সেই দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্মের মত হারাইব, তাহা কে জানিত? অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। জ্ঞানতঃ কখনও যে কাহারও মনে ব্যথা দিয়াছি, তাহা মনে হয় না, তবে কোন্ পাপের ইহা প্রতিফল? অবোধ বালিকা প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, আমিও সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্যা দেবী করিয়া তারই জন্য পাগল হইয়াছিলাম। তাহাকে পাইলাম না, বুঝিলাম—এই দেবী আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তির জন্য সৃজিত হন নাই। ইনি স্বর্গের, আমি মর্ত্ত্যের, আমাদের মিলন কি প্রকারে ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইবে?

বাল্যকাল হইতেই আমি অদৃষ্টকে বড় বিশ্বাস করি। যখন আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, কোন মতেই আমার হইবে না, ভবিষ্যতের দিকে চাহিলাম না, চিরদিনের জন্য স্বদেশের নিকট বিদায় লইলাম। কয়েক বৎসর নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার স্মৃতিও মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। যখন কোন ভালবাসার চিত্র পাঠ করিতাম বা কাহারও মুখে ভালবাসার কথা শুনিতাম, তখন আবার সেই স্মৃতি অন্তরে উদিত হইত, একাকী বসিয়া কাঁদিতাম।

কাঁদিতে জন্মিয়াছি কাঁদিব, কাঁদিতে আর কাতর নহি; ক্রন্দনেও কিছু সুখ আছে, যদি সেই ক্রন্দনে কেহ কাঁদিবার লোক থাকে। আমার কে আছে; ইহসংসারে আমার জন্য কার নয়নে একবিন্দু অশ্রুপাত হইবে? প্রাণের জ্বালা প্রাণের মানুষের নিকট বলিলে মনে অনেক শান্তি পাওয়া যায়। আমার ত প্রাণের মানুষ কেহ নাই, তবে এ ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী কাহাকে বলিব, কে শুনিবে? অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, এ পোড়া বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজে আমার মত হতভাগ্য লোকের

সংখ্যা অধিক না হইলেও, বোধ হয়, একেবারে অভাব হইবে না। আমি সেই বহু বৎসরের প্রাণের জ্বালা যাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছি, তাহাই বিবৃত করিয়া জীবনের ভার কিছু পরিমাণে লাঘব করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম যখন আমরা হুগলীতে আসি, তখন আমার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। আমি আমার পিতার বৃদ্ধবয়সের একমাত্র সন্তান। আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য ও জীবনের শেষ অবস্থাটা গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবার মানসে পাণ্ডুয়ার সন্নিকটস্থ আমাদের গ্রাম ত্যাগ করিয়া পিতাঠাকুর হুগলিতে আগমন করেন। সে সময়ে আমাদের সংসারে পিতা, পিতার এক দূরসম্পর্কীয় খুড়ি, এক বিধবা পিসী, একটি আমার সমবয়স্ক পিসীত ভ্রাতা ও আমি। স্নেহময়ী মাতার ক্রোড়ে লালিত হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, অতি শৈশবেই তিনি আমাদের ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যান; উক্ত পিসিমাতাই আমাকে লালনপালন করেন। পিতাঠাকুর আমাকে ও দাদাকে হুগলি ব্রাঞ্চস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, এবং বাটীতে পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দাদা ও আমি এক ক্লাশেই পড়িতাম। আমরা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে স্কুলে যাইতে লাগিলাম, শিক্ষকের নিকট বাটীতে পড়িতে লাগিলাম, খেলিবার উপযুক্ত সঙ্গী ছিল না, সেইজন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোপাল জ্যেঠার সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিতেন। ইনি আমাদের সংসারে বহুদিবস ছিলেন, বাবা তাঁহাকে গোপাল দাদা বলিতেন। আমরাও গোপাল জ্যেঠা বলিতাম। প্রায় ছয় মাস এইরূপে কাটিল এবং ক্রমে আমাদের সঙ্গীর অভাবও দূর হইতে লাগিল।

পাড়ার মধ্যে একজন ভদ্রলোক বিদেশ হইতে আসিয়া বাস করিলে সকলেই তাহার প্রতি সহানুভূতি করিয়া থাকেন। আমরাও শীঘ্রই সকলের যত্নের পাত্র হইলাম; প্রতিবাসী অনেক বালকের সহিত আমাদের আলাপ হইল; কিন্তু পিতাঠাকুর কাহারো সহিত বড় মিশিতে দেন না। এই সময়ে ঠিক আমাদের পার্শ্বের বাটীতে রমাপ্রসাদ মিত্র নামে একজন সবজজ বীরভূম হইতে বদলী হইয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমাপ্রসাদ

বাবুর বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর, তিনি একজন আমোদপ্রিয় ভদ্রলোক, লোকের সহিত আলাপ করিতে বড়ই ভালবাসেন।

জজবাবু হুগলিতে আসিয়া প্রথমেই বাবার সহিত আলাপ করেন। এখন বাবা প্রায় প্রতিদিবসই উঁহাদের বাসায় যান, জজবাবুও সুবিধা পাইলেই আমাদের বাটি আসেন। আমিও এই সময় হইতে সময়ে সময়ে বাবার সহিত উঁহাদের বাটি যাইতে লাগিলাম; জজবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র যামিনীর সহিত আলাপ করাই আমার যাইবার উদ্দেশ্য। প্রতিদিনই যামিনীর সহিত কথা কহিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়; কিন্তু লজ্জাবশতঃ পারি না। যামিনীকে আমাদের বাটীতে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্যও মধ্যে মধ্যে বাবাকে অনুরোধ করি। ক্রমে আমাদের লজ্জা তিরোহিত হইয়া উভয়ের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইল। এক্ষণে অপর প্রতিবাসী অপেক্ষা জজ-বাবুদের সহিতই আমাদের অধিক প্রণয় হইল। আর যামিনীকেই আমরা মনোমত বন্ধু পাইলাম। উঁহার সহিত খেলা করিতে বা উঁহাদের বাসায় যাইতে আমাদের কোন নিষেধ নাই। যামিনী আমাপেক্ষা বোধ হয় দুই বৎসরের ছোট, জজবাবু উঁহাকে সে সময় কোন বিদ্যালয়ে দেন নাই, বাটীতে গৃহ-শিক্ষকের দ্বারা পড়ান; আমি যে সকল পুস্তক পড়ি, সেও প্রায় তাহাই পড়ে। জজবাবুদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে আমার পিতার খুড়ীর মৃত্যু হয়, যথাসময়ে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হইল। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে জজবাবু তাঁহার কন্যা বীণাকে লইয়া আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আসিলেন। বীণাকে আমিই এই প্রথম দেখি। আমার বেশ স্মরণ আছে, বাবা বীণার হাত ধরিয়া বাটীর ভিতরে লইয়া আসিতেছিলেন, আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"সুরেন, জজবাবুর মেয়ে এসেছে, হাত ধরে ভিতর বাটীতে নিয়ে যাও।" পাঠক মহাশয় জানিবেন, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ। জজবাবুর কন্যা অর্থাৎ যামিনীর ভগ্নী শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সেই সুহাসিনী বালিকার সুকোমল হস্তধারণ করিয়া পিসিমার নিকট লইয়া গেলাম এবং বলিলাম,—"পিসিমা!

এটি জজবাবুর মেয়ে, ভাল কোরে যত্ন কোরো।" যামিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহার এক বড় দাদা আছেন, তিনি আসামে টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে চাকুরি করেন, আর মেজ দাদা কলিকাতায় পড়েন; তাহার ভগ্নী একটি, সেইটী সর্ব্ব কনিষ্ঠা. ইতিপূর্ব্বে তাহার ভগ্নীকে দেখি নাই, যামিনীর হুগলিতে আসিবার অল্প পরেই বীণা তাহার মাতার সহিত কলিকাতায় মাতুলালয়ে মাতামহীর মরণাপন্ন অসুখের জন্ম দেখিতে গিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিল; আমাদের বাটীতে শ্রাদ্ধের দুই এক দিবস পূর্ব্বে হুগলীতে আসে।

তৎকালে বালিকার রূপ কিরূপ ছিল, বর্ণনার দ্বারা বেশ বুঝাইতে পরিব এরূপ বোধ হয় না, তবে এই বলিতে পারি, বালিকাকে একবার দেখিয়াই আশ মিটে না, সর্ব্বদাই দেখিতে ইচ্ছা হয় ও কথা কহিবার জন্ম মন ব্যাকুল হয়; এবং তাহার সহিত কথা কহিবার পূর্ব্বেই বুঝিলাম, বালিকা অতিশয় লজ্জাশীলা ও সুশীলা। বীণার বয়ঃক্রম তখন নয় বৎসর।

আমরা ছিলাম তিনজন, এখন হইলাম চারিজন। পূর্ব্বের ন্যায় যামিনীর বাসায় প্রায় প্রতিদিনই যাইতে লাগিলাম। সেও আমাদের বাটীতে আসিতে লাগিল। ক্রমেই আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইতে লাগিল, এখন আমরা উভয়কে উভয়ে না দেখিলে কাতর হইয়া থাকি। বীণা এখন আমাদের সহিত কথা কহিতে আর লজ্জা করে না বরং আমার সহিত খেলা করিতে, আমার নিকট গল্প শুনিতে ভালবাসে। এখন একদিন উহাদের বাসায় না যাইতে পারিলে বীণা কারণ জিজ্ঞাসা করে, ও তজ্জন্ম দুঃখ প্রকাশ করে। জজবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, ইহাই জগতের নিয়ম। আমাদের দিনগুলি বেশ সুখে কাটিতেছিল, এমন সময় যামিনী কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল; প্রথমে সামান্য জ্বর হইয়া পরে বিকারে দাঁড়াইল। যামিনীর পিতা মাতা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। চিকিৎসা রীতিমতই হইতে লাগিল। একপক্ষ কাটিয়া গেল, কিন্তু রোগের কিছু উপশম হইল না। দাদা ও আমি দিবসের মধ্যে যতক্ষণ পারি, যামিনীর নিকট বসিয়া থাকি। বীণাও প্রায়

দিনরাত তাহার দাদার নিকট বসিয়া থাকে, কখন বা তাহার ছোট হাত দুখানি দাদার গাত্রে বুলাইয়া দেয়। বীণা পড়া শিখিতে বড় ভালবাসে, দাদার অসুখের জন্য পিতার নিকট পড়া বলিয়া লইবার বেশ সুবিধা পায় না, সেই কারণে মাঝে মাঝে আমার নিকট জানিয়া লয়।

প্রায় পঁচিশ দিন গত হইল, যামিনীর বিকারের অবস্থা কাটিল; কিন্তু জ্বর আসা বন্ধ হইল না। বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া জজবাবু অপর একজন ভাল ডাক্তারকে দেখাইবার মনস্থ করিলেন। চন্দননগরের নিতাই বাবুর তখন বেশ পসার, তাঁহাকেই দেখান মত হইল; তিনি আসিবার পাঁচ সাত দিবস পরে যামিনীর জ্বর বন্ধ হইল। সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ডাক্তারের পরামর্শমতে এক চল্লিশ দিবস পরে অন্ন আহার দেওয়া হইল। এখন, যামিনী উঠিতে পারিত না, আমরা যাইতাম, গল্প করিতাম, তাহাতে সে অনেক ভাল থাকিত। যাইতে বিলম্ব হইলেই যামিনী ডাকিতে পাঠাইত। বীণাকেও এখন আর গল্প না বলিলে ছাড়িত না।

যামিনীর সহিত আলাপ হইবার পর যেমন উহার প্রতি আমার মনের ভাব হইয়াছিল, বীণার প্রতিও এখন সেইরূপ।

যামিনীর পীড়ার পর তিন চারি মাস গত হইয়াছে, সে এখন উঠিয়া বেড়াইতে পারে, বাহিক কোন পীড়া নাই, কিন্তু দুর্ব্বলতা কোনমতেই সারিতে পারিতেছে না। ডাক্তারের মত লইয়া জজবাবু পুত্রকে কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মধুপুরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠাই-বার স্থির করিলেন। আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বোধ হয়, এত দুঃখ ইহার পূর্ব্বে কখন পাই নাই। যামিনীও অনেক কাঁদিল। যথাসময়ে যামিনীর মেজ দাদা উহাকে মধুপুরে রাখিয়া আসিলেন।

যামিনী মধুপুরে যাইবার পর কিছু দিবস আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া-ছিল, সময়ে সে কষ্টের অনেক লাঘব হইল। এখন বীণার সঙ্গীর মধ্যে আমি; যথার্থ কথা বলিতে কি, বীণা দাদার অপেক্ষা আমার সহিত কথা কহিতে, আমার সহিত খেলা করিতে অধিক ভালবাসে। দাদা নিকটে না থাকিলে সে যেন আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে। এখন আমি সময় পাইলে একাকীই বীণাদের বাটী যাই, অন্য খেলা আমাদের কিছুই নাই, দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া কথা কহিতেই বেশ লাগে, সে কথায়

যে কি সুধামাখান আছে, তাহা জানি না, তাহার অন্ত নাই। বীণাকে ছাড়িয়া আমার বাটী আসিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল বাবা পাছে রাগ করেন, সেই জন্য সন্ধ্যা হইলেই বাটী আসি, মন বীণার কাছেই থাকে, সন্ধ্যার পর মাষ্টার মহাশয় পড়াইতে আসেন, মন দিয়া পড়িতে চেষ্টা করি, তথাপি সময়ে সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া যাই। ইহা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় দুই এক দিবস আমাকে বলিলেন, "সুরেন। আজ কাল তুমি পূর্ব্বের চেয়ে অমনোযোগী হয়েছ।"

চক্ষের অন্তরালে থাকার জন্য কি কিসের জন্য জানি না, যামিনীর জন্য এখন আর প্রাণ তত কাঁদে না। যামিনী মাঝে মাঝে চিঠি দেয়, উত্তর না দিলে পাছে কিছু মনে করে, তাই দুই চারি ছত্র যাহা হয় লিখিয়া উত্তর দি'। এখন আমার হৃদয় বীণাময়, আমার সকল সুখ বীণা, বীণাই আমার সর্ব্বস্ব। যে দিবস বীণাকে অন্ততঃ একবার না দেখিতে পাই, সে দিবস আমার পড়া-শুনা কিছুই হয় না।

এখনও আমি আমার মন দেখিতে পাই নাই, বীণা আমার সকল সুখের আকর ইহাই জানি, ভবিষ্য-জীবনের চিন্তা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, বীণা হইতেই যে আমার জীবন মরুপ্রায় হইতে পারে, তাহা ভাবিবারও এখন অবসর পাই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখের সময় শীঘ্রই চলিয়া যায়, আরো একটি বৎসর কাটিল। এই বৎসর আমরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিব। যামিনী বেশ আরোগ্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন আর ঘরে পড়ে না, হুগলি কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও যামিনীদের বাটি যাই, কিন্তু এখন যামিনীর জন্য নহে, বীণার জন্য। যামিনীর সহিত হাসিয়া কথা কহি, খেলা করি, কিন্তু শত চেষ্টাতেও পূর্ব্বের মত মনের ভাব দেখাইতে পারি না। এখন বীণার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া এক স্থানে বসিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতে লজ্জা করে। জানি না, যামিনী ইহা বুঝিতে পারে কি না।

পরীক্ষার আর সবে মাত্র তিন মাস আছে, আমার চমক ভাঙ্গিল, টেষ্ট পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইল না, মনে বড় ভয় হইল, অধিক রাত্র

জাগরণ করিয়া পাড়তে আরম্ভ করিলাম। আহার নিদ্রার ন্যায় বীণাদের বাটী যাওয়া একটা নিত্য কার্য্যের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। বৈকালে প্রতিদিনই একবার বীণাদের বাটী যাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া আসি। একমাস, পনের দিন, দশদিন করিয়া ক্রমে পরীক্ষা আসিল, যেরূপ লিখিলাম, তাহাতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারিব আশা হইল। মন কিছু খারাপ হইল। দাদা বেশ লিখিয়াছেন শুনিয়া আমি সুখী হইতে পারিলাম না।

এখন আমাকে স্কুল যাইতে হয় না, যামিনী স্কুলে যায়, আমি এখন প্রায় সমস্ত দিনই বীণাদের বাটীতে থাকি। এই সময়ে আমরা আমাদের বাগানের একস্থানে একটি ফুলবাগান নির্ম্মাণ করি। কোন কোন দিবস দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেই আমরা বাগানে যাই, রৌদ্র লাগে, আম গাছের ছাওয়ায় বসিয়া হাতের উপর হাত রাখিয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া প্রাণের কথা প্রাণের ব্যথা আমি বীণাকে বলি, বীণা আমায় বলে। জীবনে যদি কখন সুখী হইয়া থাকি, তবে এই সময়ে। বীণার মনে কোন কষ্ট হইলে আমি ভিন্ন তাহা আর কেহ জানিতে পারে না। একদিবস কথায় কথায় বীণাকে বলিলাম,—"বীণা। ভাই, তোমার বিয়ে হ'লে ত আর এমন করে কথা কহিতে পাব না, তখন আমি কেমন ক'রে থাক্‌ব?" তাহাতে বীণা উত্তর দিল,—"তোমার সঙ্গে যদি হয় ত বিয়ে কোরব, না হ'লে কখনই কোরবো না।" বালিকার বালিকাসুলভ কথা শুনিয়া তখন হাসিলাম, বুঝিলাম না যে, এ যে সে বালিকা নয়, মনে করিলে সবই করিতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একদিবস আমি, বীণা ও যামিনী আমাদের বাটীর ছাদে বসিয়া ভাগীরথীর তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিতেছি ও নানা বিষয় কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় ব্রজবাবু উঁহাদের বাসার জানালা হইতে আমাকে ডাকিলেন, আমি আলিসার নিকট হইতেই উত্তর দিলাম। ব্রজবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সুরেন্। আমাদের কি খাওয়াবে বল? তোমাদের পাশের খবর বেরিয়েছে।" আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না, বলিলাম,—"কোন্ ডিভিজনে বলুন?" ব্রজবাবু

বলিলেন, "তুমি প্রথম বিভাগে, তোমার দাদা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।" আমাদের পাশের সংবাদে বাবা, পিসীমা, বীণা, যামিনী ইত্যাদি সকলেই আনন্দিত হইলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিল, আমি হুগলি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। জজবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া, বাবা দাদাকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাঠাইলেন।

নূতন উৎসাহে নূতন নূতন বিষয় সকল মনোযোগ দিয়া শিখিতে লাগিলাম। এখন যামিনীতে আমাতে একত্রেই কলেজ যাই; যামিনী আমাকে পূর্ব্বে যে চক্ষে দেখিত, এখনো সেইরূপ দেখে, কিন্তু আমি আর তেমন পারি না, আমি যামিনীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসি, কিন্তু পূর্ব্বের ভাব আর আমাতে নাই। বীণা এখনও বালিকা, তবে এখন সে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। অপরের সাক্ষাতে আমার সহিত সে এখন সকল কথা কহিতে পারে না।

জলের ন্যায় জীবনের আরো দুইটী বৎসর সুখে অতিবাহিত হইল। আমি দ্বিতীয় বিভাগে এল্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইলাম। যামিনী এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করিল এবং ২০৲ টাকা জলপানি ও কলেজ হইতে একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইল।

আমাকে ডাক্তারি শিখাইবার সাধ বাবার অনেক দিবস হইতে ছিল, এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াই মেডিক্যাল কলেজে পড়া হইত; একাকী কলিকাতায় থাকিতে কোন কষ্ট হয় এই আশঙ্কায় পিতাঠাকুর সে সময়ে ইহাতে মত করেন নাই। এইবার আমাদের বাসায় থাকিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়া স্থির হইল।

কলেজ খুলিতে আর পাঁচ দিবস বিলম্ব আছে, একদিন বৈকালে বীণাদের বাসায় গিয়া শুনিলাম, আজ বীণাকে কলিকাতা হইতে দেখিতে আসিবে; বীণা তখন বাটীর ভিতর ছিল। অন্য দিন হইলে হয়ত ভিতর বাটীতে যাইয়াও বীণার সহিত দেখা করিতাম, কিজন্য জানি না, আজি আর যাইতে পারিলাম না। যামিনীকে না বলিয়াই বাটী আসিলাম। বাটীতে আসিয়া কিছুই ভাল লাগিল না, এক প্রকার যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অতীতের দিনগুলি একবার চিন্তা করিয়া, অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, অতীব দুর্গম, কোন দিকে পথ দেখ ...

একাকী বসিয়া টেবিলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বীণার বিষয় চিন্তা করিতেছি, যামিনী চুপি চুপি আসিয়া আমার পৃষ্ঠে হাত দিল, আমি চাহিয়া দেখিলাম; বড়ই অপ্রস্তুতে পড়িলাম। যামিনী বলিল,—"সুরেন। আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে গিয়াই চলে এলে কেন? আমি কি করেছি?" আমি বলিলাম,—"শরীরটা আজ বড় অসুস্থ আছে, তাই বলে চলে এলাম, তুমি আবার কি কর'ব ভাই।" কোনও ওজর আপত্তি চলিল না, যামিনীদের বাটী যাইতে হইল। বীণাকে দেখা হইয়া গেল, ভোজনাদির পর সমাগত বাবুরা চলিয়া গেলেন। আমি বাটী আসিতেছি, এমন সময়ে জজবাবু ও যামিনী আহার করিয়া যাইতে বলিল; কথা ঠেলিতে পারিলাম না, অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আহার করিতে হইল। বীণা পান দিতে আসিয়া পানের সহিত একখণ্ড কাগজ দিয়া গেল।

জজবাবুর নিকট বিদায় হইয়া বাটী আসিয়া পত্রপাঠে অবগত হইলাম যে, বীণার বিবাহ জজবাবু ঐ স্থানে দিবেন না, উহারা আপনা হইতেই আসিয়াছিল। মনে কিছু শান্তি পাইলাম না; একটি নূতন চিন্তা আসিয়া আজি হইতে আমার অন্তরের কিছু অংশ অধিকার করিল।

পরদিবস বীণার নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইলাম, বীণা আরও বলিল,—"কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয়নি, আমি বাবার ও মায়ের সব কথাবার্ত্তা শুনেছি, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবারই তাঁদের ইচ্ছা, বাবা বলেছেন, শীঘ্রই জ্যেঠা মহাশয়কে বলিবেন।"

বীণা বাবাকে জ্যেঠা মহাশয় বলে। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম, আজি হইতে বীণাকে পাইবার আশা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আগামী কল্য কলিকাতায় যাইতে হইবে, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাটী আসিতে রাত্রি প্রায় ৯টা হইল। পড়িবার ঘরে যাইতেছি, দেখিলাম, জজবাবু ও বাবা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আমার পড়িবার ঘর বৈঠকখানার ঠিক পার্শ্বে, তথা হইতে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়; আমি চেয়ারে বসিতে যাইতেছি, জজবাবুর মুখে আমার নাম শুনিয়া কৌতূহলবশতঃ কবাটের অন্তরাল হইতে শুনিতে লাগিলাম, বুঝিলাম,

আমার বিবাহেরই কথা হইতেছে। বাবা বলিলেন,—"বীণার মত মেয়েকে বউ কর্‌তে কার না সাধ রমাপ্রসাদ বাবু! এজন্য আর অনুরোধ কি? আর আপনার সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়াও ভাগ্যের বিষয়।"

জজবাবু। আপনার পুত্র গুণবান, বীণার অপেক্ষা অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হ'তে পারে; তবে সুরেনের সঙ্গে বীণার যে রকম ভালবাসা জন্মেছে, এতে উভয়ের বিবাহ হ'লে বড় সুখের হয়।

বাবা। বীণার সঙ্গে সুরেনের বিবাহ হয় অনেক দিন থেকেই ইহা আমার ইচ্ছা, প্রায়ই মনে করি, আপনার কাছে এ বিষয়ের কথা তুলবো; যা হোক, মহাশয়ের যখন সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, তখন ভালই হয়েছে।

এইরূপ আরও অনেক কথা শুনিলাম, আমাদের বিবাহ নিশ্চিত ইহা মনে ঠিক করিলাম। জজবাবু চলিয়া গেলেন। আমি চেয়ারে বসিয়া কত সুখের স্বপন দেখিতে লাগিলাম।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, মানব মন সদাই পরিবর্ত্তনশীল। চারি দিবস পূর্ব্বে যে দিন বীণাকে দেখিতে আইসে, আমি মনে করিলাম, বীণা আমার হইল না, কত কাঁদিলাম। আবার আজ শুনিলাম, আমার সহিত বীণার বিবাহের কথা হইতেছে; আর সুখের সীমা নাই।

প্রভাত হইল, আজি কলিকাতায় যাইব, মন বড় খারাপ হইল। পাঁচ বৎসর হুগলিতে আছি, একদিনের তরেও অন্যত্র যাই নাই; কেমন করিয়া কলিকাতায় থাকিব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম; যে বীণাকে একদিন না দেখিলে জগৎ আঁধার দেখি, তাহাকে ছাড়িয়া কেমনে থাকিব!

আহারের পর বীণাদের বাসায় গেলাম, যামিনী তখন কলেজে গিয়াছে, জজবাবুও কাছারিতে; বীণা আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। কথা কহিতে চক্ষে জল আসিতে লাগিল। আমাদের বিবাহের কথা যাহা আমি শুনিয়াছিলাম, সব বলিলাম। বীণা অধিক কথা কহিল না, আমার কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া লইল, শীঘ্র আসিতে অনুরোধ করিল; আর চক্ষের জলে আমার বক্ষঃ ভিজাইল।

৩৷৹টা বাজিল, যামিনী কলেজ হইতে আসিল; আমি ৫৷৹টার ট্রেনে যাইব সুতরাং অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না; যামিনীর সহিত অল্পক্ষণ কথা কহিয়া উহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, তিনি জল না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। আসিবার সময় অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রণাম

করিলাম, তিনি তাঁহার অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বাবা, ছুটি হো'লেই বাড়ী এসো।"

আমি বাটী আসিলাম, যামিনীও আমার সহিত আসিল। তাড়াতাড়ি কাপড় ও পুস্তকগুলি ঠিক করিয়া লইলাম, তৎপরে পিসিমাতাকে প্রণাম করিয়া বহির্ব্বাটীতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট আসিলাম, তিনি আমাকে শারীরিক সাবধানে থাকিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। গাড়ী আসিল, সাশ্রুনয়নে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া আমি, গোপাল জ্যেঠা ও যামিনীসহ গাড়ীতে উঠিলাম। যামিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে ষ্টেসনে পৌছিলাম। ট্রেন আসিল, সবার নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম; যতক্ষণ দেখিতে পাইল, যামিনী কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আন্দাজ ৮টার সময় চাঁপাতলায় মামাদের বাসায় পৌছিলাম। মাতুল, মাতুলানী ইত্যাদির সহিত কথাবার্ত্তায় আমার কষ্টের অনেক লাঘব হইল, রাত্রি বেশ কাটিল। গোপাল জ্যেঠা প্রাতেই চলিয়া গেল। ৫।৭ দিবস ধরিয়া মামাত ভ্রাতাদের সহিত আজ মিউজিয়ম্ কাল ইডেন গার্ডেন ইত্যাদি দেখিয়া এক রকম কাটিল। কিন্তু ক্রমেই আবার যে কষ্ট সেই কষ্ট আসিয়া জুটিল, সকলই শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল, জনকোলাহলপূর্ণ কলিকাতার পথের দিকে চাহিয়া থাকি, আমার সর্ব্বদাই যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। এখন আমার কলেজের পড়া-শুনা ছাড়া কাজের মধ্যে বীণাকে ও অপরাপর বন্ধুদিগকে পত্র লেখা। বাস্তবিক বন্ধুবান্ধবদিগের চিঠি পড়া ও তাহাদের চিঠি লেখাই এখন আমার একমাত্র সুখ।

বাবা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পত্র লেখেন, কলিকাতায় আসিবার প্রায় কুড়ি দিবস পরে তাঁহার পত্র মত শনিবার দিবস বাটী আসিলাম। সে যে কি আমোদ তাহা বলিবার নয়। রবিবার। বীণাদের বাটী যাইতে সন্ধ্যা হইল। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে বাটী আসিয়াছি, দুইটি বন্ধু সকালে দেখা করিতে আসিল, তাহাদের সহিত কথা কহিতেই বেলা হইয়া গেল, মধ্যাহ্নে নানা কারণে যাইতে পারিলাম না, বৈকালেও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করিতে সময় অতিবাহিত হইল। বাস্তবিক পরীক্ষা নিকট;

সেইজন্য যামিনী রবিবারেও মাষ্টারের নিকট পড়িতেছিল, আমি মাষ্টার মহাশয়ের ও যামিনীর সহিত দেখা করিয়া পার্শ্বের ঘরে যেখানে বীণা তাহার পিতার নিকট বসিয়াছিল, সেই ঘরে গেলাম। জজবাবুকে নমস্কার করিলাম, তিনি উপবেশন করিতে বলিলেন। জজবাবু আমাকে কলেজের ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সায়ংকালীন জপ, আহ্নিক করিবার জন্য সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি ঘরে ঢুকিয়া অবধি বীণা একটু লজ্জিতভাবে একপার্শ্বে বসিয়াছিল, এতক্ষণে মুখে কথা বাহির হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বীণা! তুমি এতক্ষণ একটিও কথা কও নাই কেন?"

বীণা। আজ আমার কেমন লজ্জা করতে লাগলো।

আমি। কেন আজ হঠাৎ এ রকম লজ্জা হ'ল?

বীণা। কি জানি, বিয়ের কথা হয়ে অবধি আমার বড় লজ্জা করে, জ্যেঠা মহাশয়ের সাম্‌নে বেরুতে বড় লজ্জা হয়, তিনি বাড়ীতে এলেই আমি বাড়ীর ভিতর যাই।

আমি। আর কিছু বিয়ের কথা হয়েছিল?

বীণা। একদিন মেজদাদা এসেছিলেন, মা সব কথা বল্লেন, আরো বল্লেন, বোধ হয় অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হ'তে পারে।

আমি আনন্দসাগরে ভাসিলাম, এই দিনই আমার জীবনের শেষ দিন। অনেকক্ষণ এইরূপে কথাবার্ত্তা হইল, ৯॥টার সময় মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন। আমরা যামিনীর পড়িবার ঘরে গেলাম, প্রায় তিন সপ্তাহ পরে দেখা, যামিনী কত কথা বলিল, কত জিজ্ঞাসা করিল। বীণার মাঠাকুরাণী আমাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, আজিও ছাড়িলেন না, আহার করিতে হইল, রাত্রি প্রায় ১০॥টার সময় বাটী আসিলাম।

রাত্রি বেশ সুখে অতিবাহিত হইল। কলেজ যাইতে হইবে, সেই কারণে ৮টার ট্রেণে কলিকাতায় গেলাম।

বাটী হইতে আসিবার প্রায় ৮।৯ দিবস পরে একদিন বৈকালে টাউন্‌হলে একটা মিটিং ছিল, দেখিতে গিয়াছিলাম। বাটী আসিয়া দেখি, আমার পুস্তকের উপর দুইখানি পত্র রহিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকারবশতঃ লেখা বেশ বুঝিতে পারিলাম না, বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একখানি যামিনীর, অপর খানি বীণার লেখা। দীপালোকে তাড়াতাড়ি চিঠি দুইখানি পড়িলাম,

ক্ষণেকের জন্য যেন আমার জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইল; মাথা ঘুরিল, জগৎ অন্ধকারময় দেখিলাম। উভয় পত্রেরই মর্ম্ম,—ব্রজবাবু বাঁকিপুরে বদলি হইয়াছেন, বুধবারেই তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইবে, পত্রপাঠ মাত্র হুগলিতে যাইবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। বীণা পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছে,—"সুরেন, ভাই, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইতেছে সত্য; কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা যে দেশে যাইতেছি, তোমার সঙ্গে বিবাহ দূরের কথা, বোধ হয় এ জনমে আর দেখা হবে না। ভাই, মনের সাধ মনেই রহিল, এ জনমে বোধ হয় আশা মিটিল না। যদি পার, চিরদিনের মত তোমার বীণাকে একবার দেখা দিতে এসো।"

যে দিন চিঠি পাই, সে দিন মঙ্গলবার, রাত্রেই হুগলি যাইব মনে করিলাম; কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হইল না। আমার মনের সাধ, মনের আশা মনেই রহিল। আজি হইতে আমার সকল সুখ চিরদিনের জন্য বিদায় লইল।

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে বাবা বাটী যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। আমি উত্তর দিলাম, পরীক্ষা নিকট, এখন যাওয়া হইবে না। বাবা পত্র প্রাপ্তেই পুনরায় লিখিলেন, আমি তাহাতেও যাইলাম না। শেষে গোপাল জ্যেঠা আসিয়া লইয়া গেল। বাস্তবিক হুগলিতে যাইতে আমার আর ইচ্ছা হয় না। বাটী যাইয়া বুঝিলাম, বাবা আমার প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। পিসীমাও অনেক স্নেহের ভর্ৎসনা করিলেন। আমি আহার করিতেছি, পিসীমা কথায় কথায় আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, জানিতে পারিলাম, বীণার সহিত বিবাহ হইবেক না, আমাদের সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। শুনিলাম, তাহাদের সহিত আমাদের ঘরে মেলে না; তাঁহারা এ দেশীয় নয়, সেই কারণে গ্রামের স্বজাতীয় মহোদয়গণ এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন নাই। পিসীমার কোন কথায় আমি উত্তর দিলাম না, বোধ হয় উত্তর দিবার ক্ষমতাও ছিল না। আহারান্তে শয়নগৃহে গেলাম, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। সে রাত্রে আমার মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝান আমার মত লেখকের ক্ষমতা বহির্ভূত। পরদিবস প্রাতে কলিকাতায় আসিলাম। [ক্রমশঃ]

শ্রীহরিহর শেঠ।

চো'ক গেল।

(১)

নীরব, নিস্তব্ধ এই নিশীথ নিশায়,
কে তুমি উধাও ধাও আকাশের গায়,
চো'ক গেল, চো'ক গেল,
সদা তুমি কেন বল?
কি ব্যথা পেয়েছ বল, চোকেতে তোমার,
করুণ নিনাদে তাই করিছ চীৎকার।

(২)

সুষুপ্তা ধরণী ; সবে ঘুমে অচেতন,
কে শুনিল তোমার এ করুণ নিঃস্বন।
বায়ুতে মিশা'য়ে গেল,
শূন্যেতে বিলীন হ'ল,
তোর চো'ক গেল, তায় কার কি আসিল.
শূন্যেতে রোদন তোর শূন্যেতে মিশিল।

(৩)

সেকালের সেইদিন, বহুদিন গত,
দাম্ভিক গর্ব্বিত সবে আত্মসুখে রত,
আপনি পরের হওয়া,
পরকে আপনা চাওয়া,
সেকালের সেই দিন বহু দিন গত,
সকলেই এবে দেখ স্বার্থ অনুগত।

(৪)

বুঝিয়া পরের আহা মরম-বেদন,
অকপটে প্রাণ খুলে কাঁদে বে ক'জন।
পরকে আপন করা,
সে দিন হয়েছে হারা,

শুধুই নয়ন-ধারা, নিয়ত বহিবে,
কণাজলে তুষানল আরও জ্বলিবে।

(৫)

পরদুঃখে নিয়ত রে ঝরা অশ্রুধার
সেই দিন চ'লে গেছে, আসিবে না আর ;
তাই বলি ওরে পাখি,
সুদূর গগনে থাকি,
চো'ক গেল, চো'ক গেল ফুকার নিয়ত,
কোন্ দুঃখে অশ্রুধার ঢাল অবিরত ?

(৬)

বল বা না বল পাখি। বুঝেছি সকল,
কত যে কারণে তোর অন্তর বিকল ,
স্মরিয়া রে পূর্ব্বস্মৃতি,
কাঁদ তুমি নিতি নিতি,
মানব-প্রকৃতি চক্ষে সহে না রে ভাই ,
চো'ক গেল, চো'ক গেল, ডাকিতেছ তাই।

(৭)

কি আর বলিব ভাই, কালের স্বভাব,
দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সকলি অভাব ,
পিতা পুত্রে কাটাকাটি,
ভা'য়ে ভা'য়ে লাঠালাঠী
ভীষ্মসম পিতৃভক্ত আছে হে কজন,
রামের লক্ষ্মণ মত আছে কি তেমন ?

(৮)

তৈল বিনা মাতৃশিরে উড়িতেছে ধূলা,
পুত্রের মাথায় দিব্য আলবার্ট তোলা ;
জ্যেষ্ঠ খায় ক্ষীর ছানা,
উপাদেয় দ্রব্য নানা ,
কনিষ্ঠ উপাসে কিন্তু দিবস কাটায়,
ভাই ব'লে একবার ফিরে নাহি চায় !

(৯)

মানীর নাহিক মান, গুণীর আদর,
সকলেই লুপ্ত এবে, সব হতাদর,
যার গায়ে জামা জোড়া,
তাঁর নাম বিশ্ব যোড়া,
এই সব বুঝি তোর, সহেনা রে চো'কে,
তাই বুঝি চো'ক গেল, বল ডেকে ডেকে ?

(১০)

অই দেখ হর্ম্মবাসী ধনীর সদনে,
বুভুক্ষিত চেয়ে আছে কাতর নয়নে,
যদি পায় এক মুষ্টি,
তা'তেই তাহারা তুষ্টি,
কিন্তু তাঁর রূঢ়দৃষ্টি, কর্কশ ভাষায়,
ফিরিল অভাগা, ভাসি নয়ন ধারায়।

(১১)

পরক্ষণে দেখ অই ধনী মহাজন,
আবজ্ঞা পূজায় আহা, উদার কেমন,
এবে মুক্তহস্ত হ'ল,
দীন কিন্তু ফিরে গেল,
দীর্ঘশ্বাসে অশ্রুধারা-বর্ষিত-নয়নে।
এ সব তোমার চক্ষে সহিবে কেমনে ?

(১২)

শুন দ্বিজ, তোর মত আরো কত জন,
নিশায় নীরবে ক'র অশ্রু বরিষণ,—
বিনা দোষে অবলায়
পতি ঠেলিয়াছে পায়,
পতি স্মরি কাঁদে আহা সরলা ললনা,
চক্ষে তোর সবে ইহা কেমনে বল না ?

(১৩)

ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগী অতি পাপাধম,
মানব হলেও সে পশুর অধম ;

দ্বিজ, সে হলেও দ্বিজ,
ঘৃণ্য অতি নহে দ্বিজ,
পাপীর এ পাপ মুখ দেখিতে নারিছ,
চো'ক গেল, চো'ক গেল, তাই কি বলিছ !

(১৪)

বুঝিলাম, কেন তুমি কাঁদ নিতি নিতি,
বহিছে কলুষপূর্ণ, মানব-প্রকৃতি,
দেখিয়া যে অহরহ,
মরমে মরমে দহ,
দহে বক্ষ, দহে প্রাণ, দহে তোর আঁখি,
চো'ক গেল, চো'ক গেল কাঁদ তাই পাখি ?

(১৫)

বলিতে কি এই কথা নিশি নিরালায়,
নিশিতে উধাও হেসে আকাশের গায়,
উদাস আকুল প্রাণে,
শুনাও তাঁহার কানে
জগদীশ ! চেয়ে দেখ জগতের ধারা ;
দাও দয়াময় বিশ্বে স্বর্গের সুধারা ।

শ্রীসুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় ।

রামকৃষ্ণ প্রচার ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০১ পৃষ্ঠার পর ।)

পরদিন বিজয়া। সর্ব্বমঙ্গলা সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিশুষ্ক মুখে দেবীর নিকট যাইয়া বসিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালের বিধিব্যবস্থা বিহিত কার্য্যকলাপ সমাধা করিয়া ধ্যানযুক্ত হইয়া ভগবতীকে দধিকড়মা নিবেদন করিয়া দিলেন। চাহিয়া দেখেন, সর্ব্বমঙ্গলা তাহা ভক্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, দেখ, তোমার কন্যার বিবেচনা দেখ ? কোথায় আমি ভগবতীকে নিবেদন করিয়া দিলাম, না

তোমার কন্যা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল। কি সর্ব্বনাশই হইল! দেবতা জ্ঞান নাই, ব্রাহ্মণ জ্ঞান নাই, ইহার উপায় কি হইবে? গত কল্য ব্রহ্মশাপ হইতে ভগবতীর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি, অদ্য কি না ভগবতীর ভোগে হস্ত প্রসারণ? ব্রাহ্মণের তিরস্কারে সর্ব্বমঙ্গলার নয়নে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু কোনও কথা কহিল না। ব্রাহ্মণকে স্থির হইতে বলিয়া, ব্রাহ্মণী পুনরায় দধি-কড়মার আয়োজন করিয়া দিলেন, সে বারেও সর্ব্বমঙ্গলা উচ্ছিষ্ট করিল। ব্রাহ্মণীর কথায় শান্ত হইয়া তৃতীয়বার দধিকড়মা দেবীকে নিবেদন করা হইল, সে বারেও সর্ব্বমঙ্গলা উচ্ছিষ্ট করিল। ব্রাহ্মণ রোষপরবশে "দূর হ" বলিয়া সর্ব্ব-মঙ্গলাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণী চতুর্থবার দধিকড়মার আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আহা! দূর হ কি বলিতে আছে! তুমি যাহাকে দূর হ বলিয়াছ, সে আমার নিকট যাইয়া কত কাঁদিতে লাগিল, আমি তাহাকে ভুলাইয়া ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি। ব্রাহ্মণ চতুর্থবার দধিকড়মা নিবেদন করিলেন, কিন্তু হৃদয়ে পূর্ব্ব কয়বারের ন্যায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণের মনে তখনি কেমন আশঙ্কা আসিয়া অধিকার করিল। তিনি দধিকড়মার পাত্র হস্তে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে "সর্ব্বমঙ্গলা" "সর্ব্বমঙ্গলা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না, চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ সেই দধিকড়মার পাত্র হস্তে লইয়া জমীদারের বাটীতে গমন করিলেন। তথায় সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিয়া অতি মনস্তাপে কহিলেন, "বাছা, আমি তোর পিতা, কিছু মনে করিস্ নে, এই নে, মা, যত পারিস খা।" সর্ব্বমঙ্গলা অবাক হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি তোর পিতা, অধিক বলিলে তোর অকল্যাণ হইবে, নে মা খা।" সর্ব্ব-মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কি পাগল হইয়াছ? তুমি কি বলিতেছ? তোমার মুখের ভাব দেখিয়া আমার যেন কেমন কেমন মনে হইতেছে, বাবা! তোমার কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকথা সমস্ত বলিয়া, কহিলেন—আর চালাকি করিসনে, এখন খা। সর্ব্বমঙ্গলা বলিল,—বাবা, আমি ত ইহার কিছুই জানি না। আমি কখনই বা গেলাম, কখনই বা দধিকড়মা উচ্ছিষ্ট করিলাম, আর কখনই বা তুমি আমাকে দূর হইতে বলিয়াছ? ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিবা-মাত্র বক্ষে করাঘাত করিয়া হতচেতন অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হায়, হায়! আমি কি করিলাম?

হায়, পরম পদার্থ গৃহে পাইয়া চিনিতে পারিলাম না। হায় মা! যদি দীনের প্রতি দয়া করিয়াই এলে, তবে কেন অমন করিয়া বঞ্চনা করিলে? সকল কথায় যদিও আভাস দিয়েছিলে, কিন্তু আমরা মায়াবদ্ধ জীব, কেমন করিয়া তোমার মায়া ভেদ করিয়া তোমায় চিনিব বল? তুমি যদি দয়া করিয়া দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পিতা সম্বোধন পূর্ব্বক কৈলাশ ভবন পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিলে, তবে কেন নিত্য ভাব দেখাইয়া কৃতার্থ করিলে না? মা সর্ব্ব-মঙ্গলা, একবার ফিরিয়া আইস। মা সর্ব্বমঙ্গলা, আর একবার বাবা বলিয়া ডাকিয়া যাও। মা, তুমি ধরা না দিলে তোমাকে কেহ ধরিতে পারে না, কিন্তু মা, আমার মনে বড় খেদ রহিল যে, সামান্য দধিকড়মার নিমিত্ত তুমি আমার নিকটে ছল পাতিলে? আয় মা সর্ব্বমঙ্গলা, আয় মা জগত-জননী, আয় মা দীন-দুখহারিণী, এ দীনের দধিকড়মা খাইয়া যা, আমি শান্তিলাভ করি। ব্রাহ্মণ এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন হঠাৎ অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। যেন সর্ব্বমঙ্গলার স্বরে কে, বলিতেছে, বাবা! তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমার দধিকড়মা আমি তিনবারে উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইয়াছি। আর খাইবার সামর্থ ছিল না, তাই চতুর্থবারে এই ছল করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। তুমি যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন যখনই আমাকে ধ্যান করিবে, তখনই তোমার হৃদয়মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে। যখন ভবধাম ছাড়িবে, তখন তুমি আমার নিত্যধামে নিত্যলীলা দেখিয়া—সার্থক হইবে। এখ তুমি সমস্ত ক্ষোভ পরিত্যাগ কর।

ভক্তিতে এইরূপ অঘটন সংঘটন হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব তাই বার বার বলিতেন, যে লোকে বিষয় হইল না বলিয়া এক ঘটী কাঁদিবে। পুত্র হইল না বলিয়া ভগবানের নিকট দু'ঘটী কাঁদিবে। মান ও যশের জন্য চার ঘটী কাঁদিবে। মকর্দ্দামা জিতিবার জন্য কালীঘাটে যোড়া যোড়া পাঁঠা মানিবে। কিন্তু ভগবান, তুমি কেমন, একবার দেখিব বলিয়া, কেহ কি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলি-য়াছে? যে ফেলে, সে তাহার দর্শন পায়।

আমাদের দেশের গৌরবরত্ন পরম শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় রাম-কৃষ্ণ দেবের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। একদিন রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ব্রহ্মশক্তির কথা হয়। তাহাতে রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "কেশব ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া ত দেখিয়াছ, কিছু পাও নাই, একবার মা ব্রহ্মময়ী বলিয়া ডাক দেখি, এখনই তাঁহার দর্শন পাইবে। যে ঈশ্বর দর্শন এখন অদর্শন

হইয়া রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিবে। যে ঈশ্বরকে জ্ঞানে নিরাকাব বলিয়া সাবস্ত্য করিয়াছ, তাঁহাকে সাকাররূপে নিকটে পাইবে। একবার সরলভাবে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া দেখ, আনন্দময়ী আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি দর্শন দিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইবেন। তাঁহাকে চায় কে? পাছে তিনি আইসেন, পাছে তাঁহার দর্শন হয়, এইজন্য একেবারে তাঁহার রূপ উডাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কি আর দেখা যায়? যত্তপি তাঁহাব দর্শনের জন্য তিন দিন কাঁদিতে পার, তখনি তাঁহাব দর্শন পাইবে।" কেশববাবু তদবধি মা শব্দে উপাসনা করিতেন—মা মা বলিয়া আত্মহারা হইতেন।

প্রভু যীশুকৃষ্ণ একদিন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, বলিতে পারেন, ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় কি না? যীশু বলিলেন, আমাব সঙ্গে আইস। এই বলিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া বৃদ্ধকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। যখন সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইয়া পডিলেন, তখন যীশু তাহার গলা টিপিয়া একেবারে জলে ডুবাইয়া ধবিলেন। বৃদ্ধ জলের মধ্যে ছটফট্ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পবে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া যীশু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এখন কিরূপ অবস্থা? সে বলিল, "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়।" যীশু বলিলেন, যখন ভগবান অদর্শনে প্রাণের এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন তাঁহার দর্শন পাইবে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ঘোর বিষয়ীর বিষয় নাশ হইলে তাহার প্রাণটা যেমন হয়, পিতামাতাব একমাত্র উপযুক্ত পুত্র মরিয়া গেলে তাহাদের প্রাণটা যেমন হয়, সতী নারীর পতিবিয়োগ হইলে তাহার প্রাণটা যেমন হয় এবং কোনও ব্যক্তি জলমগ্ন হইলে তাহার প্রাণটা যেমন হয়, ভগবান দর্শনের নিমিত্ত যাহার প্রাণের অবস্থা সেইরূপ হয়, সেই ভগবানকে দর্শন করিতে পারে।

এতক্ষণ ধরিয়া যে সকল কথা বলিয়া আসিলাম, সে সমস্তই সাধন সাপেক্ষ। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান সকলেব ধর্ম্মসাধনের প্রণালী আছে ও সেই মতে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কার্য্য বা সাধন করিতে পারিলে, তবে কালে সিদ্ধ হওয়া যায়। সাধনাদি যাহারা করেন, তাহারাই জানেন যে, সে সমস্ত কি প্রকার কঠিন ব্যাপার। হটযোগের একটী আসনে সিদ্ধ হইতে হইলে ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। প্রাণায়ামের বায়ু ধারণা করিতে গিয়া কত লোকের কাশরোগের উৎপত্তি হইয়াছে। নেতী নৌতি প্রক্রিয়ায় কত লোকের জীবনান্ত ঘটিয়াছে! তন্ত্রমতে সাধনা করিতে গিয়া

কত লোকে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। বহু ক্লেশে তবে সিদ্ধ হওয়া যায়। এই আশ্রমবাসীর * নিকট প্রায়ই শুনিতে পাই যে, যখন ইনি সাধনের এক কার্য্য ছাড়িয়া অন্য কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন দেহ অভিনব ভাব ধারণ করে। এই সাধন পথে আবার অনেক বিঘ্ন আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান বিঘ্ন, কামিনী এবং কাঞ্চন। কত সাধক কামিনীকাঞ্চনের আকর্ষণে পতিত হইয়া, উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ কামিনীর আকর্ষণে পড়িয়া লোমপাদের গৃহে শান্তনুকে বিবাহ করিয়া রাজভোগে রত হইয়াছিলেন। পরাশর ধীবর কন্যা দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া ছিলেন। মেনকা দর্শনে বিশ্বামিত্র জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। কাঞ্চনের কথা অধিক কি বলিব, অনেক সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা পরজন্মে রাজা হইবার জন্যই কেবল সাধনা করিতেছেন। এই কামিনীকাঞ্চন কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা রামকৃষ্ণদেব দেখাইয়া গিয়াছেন। কামিনী সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, ইহা একটী হাড়ের খাঁচা। মাংস ও তদুপরি চামড়া দ্বারা আবৃত। যদ্যপি উপরের চামড়াটী ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি বহির্গত হইবে? মাংস, শোণিত ও বসা। তাহা লইয়া কি হইবে? এইরূপ মীমাংসা করিয়া তিনি কামিনী ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক মাত্রেই তিনি মা আনন্দময়ী, মা ব্রহ্মময়ী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মথুর বাবু, রামমণি প্রভৃতি তাঁহাকে কামিনী সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। একদা মথুরবাবু বেড়াইতে যাইবার ছল করিয়া রামকৃষ্ণকে মেছুয়াবাজারে লক্ষ্মীবাই নামক একটী বেশ্যার বাটীতে লইয়া-গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী ১৫।১৬টী যুবতীকে অৰ্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছিল। রামকৃষ্ণকে গৃহে রাখিয়াই মথুরবাবু বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। যুবতী-গণ রামকৃষ্ণের মনাকর্ষণ করিবার জন্য মোহিনী জাল বিস্তার করিতে লাগিল। তিনি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে 'মা আনন্দময়ী' 'মা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং কিছু পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

কাঞ্চন সম্বন্ধেও তাঁহাকে অনেক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। মথুরবাবু একবার ৫০,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ করিয়া দিতে চাহেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, কালীর ইচ্ছায় যখন এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে, তখন আর

---

* শ্রীমদ্ প্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী।

টাকা লইয়া কি করিব? লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী তাঁহার নামে একবার ১০০০০৲ টাকার কাগজ করিয়া দিতে চাহেন, তাহা লইতে তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি সাধনার দ্বারা মনকে ও দেহকে কাঞ্চন হইতে এত পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, কোন মূল্যবান দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে পারিতেন না। অর্থ স্পর্শ করিতে গেলেই তাঁহার হস্ত বাঁকিয়া যাইত। এই প্রকারে সাধন ভজন করিতে পারিলেই প্রকৃত সাধন ভজন করা হয়।

যাঁহারা এইরূপে সাধন ভজন করিয়া আপন আপন ধর্ম্মপথে চলিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তোমার যে মত, যে ভাব, সেই মতে সেই ভাবে সাধনা কর, সিদ্ধ হইয়া ভগবান লাভ করিবে। কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দা বা কুৎসা শুনিয়া তোমার পথ ছাড়িও না। তুমি যে পথে সাধনা করিতেছ, আমিও তিন দিন ঐ পথে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলাম। তুমি কোনও সংশয় করিও না, নিশ্চয়ই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। আপন পথে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাক। এ সম্বন্ধে তিনি একটী গল্প করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এক ব্যক্তির একটী পাতকুয়া কাটিতে সাধ হইয়াছিল। একস্থলে দুই হাত মাটী কাটিয়াছে, এমন সময়ে একজন বলিল, "ভাই, এখানে অত্যন্ত বালি, অনেক কাটিতে হইবে বরং একটু অগ্রসর হইয়া কাট। তাহা হইলে ভাল জল বাহির হইবে। সে তাহার কথা শুনিয়া সে স্থল ছাড়িয়া আর এক স্থলে খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। সেখানে আসিলে আর একজন বলিল, এখানে পূর্ব্বে পাতকুয়া ছিল, এখানে না খুঁড়িয়া আর এক স্থলে কাট। এইরূপে যেখানে খুঁড়িতে যায়, সেইখানেই এই প্রকার প্রতিবন্ধক পায় এবং সে স্থান ছাড়িয়া আর এক স্থলে খুঁড়িতে আরম্ভ করে। এইরূপে তাহার আর কুয়া কাটা হইল না। কিন্তু সে ৫০ জায়গায় এক হাত দেড় হাত করিয়া খুঁড়িয়া রাখিল। ধর্ম্মপথেও সেই প্রকার আজ যাহা বিশ্বাস করিলাম, কাল একজনের কথায় তাহা ছাড়িয়া আর একটা ধরিলাম। পরশ্ব আর একজনের কথায় আর একটা পথে চলিলাম। যদ্যপি এইরূপে দশজনের মতে চলা যায়, তাহা হইলে তাহার কখন কিছু হয় না। যে ব্যক্তি পাতকুয়া খনন করিতেছিল, সে ৫০ জায়গায় ৫০ হাত খনন না করিয়া, এক স্থলে যদি ১৫ হাত খনন করিত, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত। যে একভাবে সাধন করিতে পারে, তাহার সত্বর কার্য্য হইয়া যায়, নানা পথে চলিলে কোনও ভাবই লাভ হয় না। তাই, তিনি বার বার বলিয়া-

ছেন, কেহ কাহারও মত ছাড়িয়া অপর মতে যাইও না এবং কেহ কাহারও মত ভ্রান্ত বলিও না।

যাহারা সাধন ভজন করিতে পারিবে, যাহারা কামিনীকাঞ্চন পদদলিত করিতে পারিবে, জানা গেল যে, তাহাদের উপায় আছে, তাহারা আপন আপন ভাবে সিদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা সাধন ভজন করিতে না পারিবে, তাহাদের উপায় কি? যাহারা বিষয়ে ঘোর লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের উপায় কি? যাহারা কামিনী-কাঞ্চনের কহকে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের উপায় কি? যাহারা লম্পট মাতাল, তাহাদের উপায় কি? যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগের নিকট বসিবার অযোগ্য, যাহারা পাপী তাপী অনাথ অনাথিনী, যাহারা কাঙাল কাঙালিনী—যাহাদিগকে কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থান দেন না, তাহাদের উপায় কি? যাহারা সাধুর নিকট গেলে সাধুর আশ্রম অপবিত্র হয়, যাহারা গৃহস্থের বাটীতে গেলে, গৃহস্থেরা দূর দূর করিয়া ঘৃণাবশে নিকটে যাইতে দেন না, সেই সমস্ত নরাধমদিগের উপায় কি? তাহারা দাঁড়ায় কাহার নিকট? তাহাদিগকে কে আশ্রয় দেয়? তাহাদিগকে কে উদ্ধার করে? যদ্যপি এই শ্রেণীর কেহ এখানে থাকেন, তবে তিনি শুনুন, এই শ্রেণীর উপায় একমাত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণই তাহাদের বল, রামকৃষ্ণই তাহাদের ভরসা। তদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য কোনও উপায় নাই। এই সমস্ত লোকের নিকট রামকৃষ্ণ ভগবান, এই সমস্ত লোকের তিনিই একমাত্র আশ্রয়। সমাজ ছাড়া, ধর্ম্ম ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া, কর্ম্ম ছাড়া, কত শত পাষণ্ড যে তাঁহার কৃপায় চরিতার্থ ও তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। সে সমস্ত লোকের কথা বলিতে গেলে ১০ দিনেও শেষ হয় না। তিনি বলিতেন, কলির জীবন অতি সংক্ষেপ, তাহাতে আবার নানাপ্রকার নূতন নূতন পীড়ায় লোকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জীবিত রহিয়াছে মাত্র। এক ম্যালেরিয়া অর্থাৎ মেলেরিয়া জ্বরেই ত লোকে অনবরত কোঁ কোঁ করিতেছে, এ অবস্থায় সাধন ভজন করিবে কখন? তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমরা আমাকে ভার দিয়া যাও, তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি বলিতেন, যেমন রাজাগণ সময়ে সময়ে আপন আপন রাজ্যমধ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন অথচ কেহ তাঁহাদের চিনিতে পারে না, এবারে আমিও সেইরূপ ছদ্মবেশে আসিয়াছি, এবারে হঠাৎ আমাকে লোকে চিনিতে পারিবে না। তিনি বলিতেন, প্রতিদিন সকালে একবার আমার নাম করিয়া উঠিও, তাহা হইলে তোমাদের

আপনাপনি তত্ত্বজ্ঞান হইয়া যাইবে, আর শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে না। আমাদের ইদানীন্তনের বিদ্বান ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাই রামকৃষ্ণের বিশেষ পক্ষপাতী। কত শত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যে রামকৃষ্ণের উপাসক, তাহা বলা যায় না। তৎকালীন মহাবিজ্ঞ কেশববাবু সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে, তিনি একদিন রামকৃষ্ণদেবকে তাহার বাটীতে লইয়া গিয়া, তাহার শয়ন গৃহে, তাহার বসিবার স্থানে, তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, সকল যায়গায় একটু পদার্পণ করুন, আমার বাটী পবিত্র হইয়া যাক্'। সর্ব্বশেষে তাহার উপাসনা গৃহে লইয়া গিয়া পুষ্পদ্বারা চরণ পূজা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'অদ্য আমার জীবন সার্থক হইল'। পরে ঠাকুরকে বলিলেন যে, আপনি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। একদিন রামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেশব আপনার মঙ্গল করিয়া লইল, কিন্তু এ কথা গোপন রাখিয়া সাধারণের অমঙ্গল করিল। যাহা হউক, রামকৃষ্ণ যে ভগবান এবং জীবের কল্যাণের নিমিত্ত যে কৃপাবশে দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যত্তপি কেহ আমাদের মত পাপী তাপী থাকেন, আসুন, রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লউন, শান্তি পাইবেন, নতুবা অনন্যোপায়। রামকৃষ্ণের দল বাড়াইবার জন্য বা কাহাকেও তাহার নিজ মত ছাড়িয়া আসিতে যে বলা হইতেছে, এ কথা কেহ মনে বুঝিবেন না। যাহারা সাধন ভজন করিতে পারিবেন না, অথচ ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে চাহেন, যাহারা কামিনী-কাঞ্চনের দাসানুদাস অথচ পরকালের উপায় চাহেন, তাহাদিগকে রামকৃষ্ণের শরণাগত হইতে হইবেই হইবে। তাই পুনরায় বলিতেছি, যদি কেহ আমাদের মত পতিত থাকেন, কাহারও আপনাকে নিরাশ্রয় ও নিরুপায় বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, যদ্যপি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে অক্ষম বলিয়া মনে হইয়া থাকে, যদ্যপি অজ্ঞান-কূপ হইতে উঠিবার কাহারও সাধ হইয়া থাকে, যত্তপি এ সংসারের রহস্য ভেদ করিবার কাহার স্পৃহা জন্মিয়া থাকে, যদ্যপি কাহারও ভগবানকে জানিবার সাধ জন্মিয়া থাকে, যদ্যপি এই নরদেহে, এই চর্ম্মচক্ষে কাহারও ভগবানের মোহন মূরতি দেখিবার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে কাহারও কুতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাকুন, রামকৃষ্ণকে লইয়া লোক-লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করুন। রামকৃষ্ণ কলির জীবন্ত্রাণ নাম। রামকৃষ্ণ নামের কত গুণ, রামকৃষ্ণ নামের কত মহিমা, যিনি একবার প্রাণে

বা অজ্ঞাস্তে, ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে, ব্যঙ্গে বা বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছেন, তিনিই তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। রামকৃষ্ণ দীনের ঠাকুর, রামকৃষ্ণ অগতির গতি, রামকৃষ্ণ পতিতপাবন, রামকৃষ্ণ মূর্খের দেবতা, রামকৃষ্ণ নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। যাঁহারা সংসারচক্রে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যাঁহারা দশদিক শূন্যময় দেখিতেছেন, যাঁহারা পরকালের উপায় ভাবিয়া হতাশ হইয়াছেন, যাঁহারা কি করিতে আসিয়া, কি করিয়া গেলাম, বলিয়া পস্তাইতেছেন—তাঁহাদেরই জন্য—রামকৃষ্ণ অবতার, তাঁহাদেরই কল্যাণের নিমিত্ত রামকৃষ্ণের দেহ ভার, কেবল তাঁহাদেরই পাপ ভিক্ষা করিতে রামকৃষ্ণ কাঙাল ও চিরভিখারী।

গণা দিন ত ফুরাইয়া আসিল। আর কতদিন ভবধামে থাকিতে হইবে? বাল্যকালে খেলা ধূলায় অতিবাহিত হইল; যৌবনে যুবতী ও কাঞ্চনসনে দিন কাটিয়া গেল। এখন ক্রমশঃ শেষদিন সন্নিকট, বিষয় বিষয় করিয়া আর বাতুলতা কেন?—সকলে পরকালের উপায়ের চেষ্টা করুন। যাহার যাহাতে বিশ্বাস, যাহার যাহাতে রুচি, যাহার যাহাতে ধারণা বা প্রীতি হয়, তিনি ভগবানের সেই ভাব লইয়া মজিয়া যাউন।

ভাই হিন্দু! তোমার যে দেবতার প্রতি বিশ্বাস, তুমি তাহাকে লইয়া মজিয়া যাও। কালী উপাসক, মাকে লইয়া হৃদয়ে রাখ। কৃষ্ণ উপাসক, রাধাপ্রেমে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া আকুল হও। ভাই মুসলমান! আল্লা নামে মহম্মদের ন্যায় উন্মত্ত হও। পেগম্বরদিগের আদেশ মত চল। শয়তান বা কাফেরদিগের ছলনায় ভুলিও না। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তোমাদের পক্ষে তোমাদের পথ অতি সুন্দর পথ। ভাই ব্রাহ্ম! প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর। কাট মাটি বলিয়া হিন্দুর দেবতার নিন্দা করিয়া হৃদয়ে দ্বেষভাবের পোষকতা ছাড়িয়া দাও। ব্রহ্মময় জগৎ, এইভাব হৃদয়ে পোষণ কর। কাট মাটি ত জগৎ ছাড়া নহে যে, তাহাতে ব্রহ্মের আবির্ভাব নাই। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই সকলের আদি। যাহা দেখি, যাহা করি, যাহা শুনি, সকলি একের বিকাশ, এই জ্ঞানই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যদ্যপি কেহ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহ, তবে যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ 'ব্রহ্মময়মিদম্ জগৎ' এই জ্ঞান যাহাতে লাভ হয়, তাহারই জন্য চেষ্টা কর। দ্বৈতজ্ঞান বিদায় দিয়া অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধ। আর যাহাদের কোনও উপায় নাই, যাহারা আমাদের ন্যায় নিরাশ্রয়, সহায়-সম্বলহীন—তাহারা রামকৃষ্ণের বিজয় নিশান উড়াইয়া, রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিয়া, সদানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যাও।

এই বক্তৃতার সহিত যে দুইটী সঙ্গীত হইয়াছিল, তাঁহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

সঙ্গীত। *

(১)

এস সবে মিলে, মহাকুতূহলে, চলে যাই সঘনে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে বদনে॥
অশন বসন ভূষণ রতন কাঞ্চন যশ মান, নাহি চায় মন প্রাণ;
চায় শয়নে স্বপনে, তাঁর নাম গুণ-গান সতত রসনা রসনে॥
চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি যে রসচয়, রসনায় নাহি চায়,
চায় সতত আননে, রামকৃষ্ণ নাম-সুধা-প্রসাদে শান্তি জীবনে॥
ভুবনমোহন রমণীবদন নিন্দিত শশধর, নাহি চাহে মন আর,
চায় সতত পরাণে, রামকৃষ্ণ-চরণযুগল হৃদয়ে নিরত ধেয়ানে॥

(২)

যদি যাবে পার, ডাক যত পার, পারে পার ভব-বন্ধনে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল কায়-মন-প্রাণ বচনে॥
সাধ যদি থাকে এ ভবে তরিতে, ত্বরিতে আরোহ ঐ নাম তরীতে,
শমনে স্ব-মনে কত শঙ্কা করিবে, ভবযন্ত্রণা যাবে,
ভবে মোক্ষফল পাবে,—শমন লবে না ছোঁবে না নিদানে॥
কলির কলুষে কাতর কায়, কায়-মন-প্রাণ সঁপ রাঙ্গা পায়,
দেহভার—দেহ ভার, কর আত্ম সমর্পণ,
পাবে আত্ম দরশন, হবে ত্রিতাপ মোচন,
কি কাজ সাধনে ভজনে পূজনে॥
তোমার হয়ে সেজন করিয়ে সাধন, কৃপায় বিলায় সাধনের ধন,
ভব ভয়—কিবা ভয়, তিনি পারের কাণ্ডারী, যম-যন্ত্রণাহারী,
জগবন্ধু শ্রীহরি—রামকৃষ্ণ সার করিবে জীবনে॥

শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

---

* শ্রীবাণীকান্ত রায়।

বীণা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে শিখিলাম, এদেশে প্রাণের মিলনই যথেষ্ট নহে, সমাজে ইহার মূল্য একেবারে নাই; পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইলে মনের মিলনের বিশেষ আবশ্যকতা নাই, কয়েকটি অতি সামান্য বিষয় মিলিলেই হইল। হায়, প্রথম যখন বীণাকে ভালবাসি, সেই এক সময় আর এই এক সময়। এখন জানিলাম, ভালবাসিবার পূর্ব্বে কুল-শীল জানিয়া ভালবাসাই আমার উচিৎ ছিল। পিতা, মাতা পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, কোথায়? যেখানে ঘর ভাল, কন্যা সুন্দরী, অর্থপ্রাপ্তির আশা আছে, সেখানে। পুত্র সুখী হইবে কিনা, একেবারে দেখেন না। পর-হৃদয়ের ভাব অনুভব করা এ অধম জাতির ক্ষমতার বহির্ভূত।

সময় কাহারো জন্য অপেক্ষা করে না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যাইতে লাগিল। অন্ততঃ মাসের মধ্যে একবার বাটী না যাইলে হয় না; বাটী অপেক্ষা কলিকাতা ভাল লাগে, বাটী যাইয়া একরাত্রের অধিক প্রায় থাকি না।

কালীপূজার ছুটিতে পিতার অসুখের কারণ, আপন ইচ্ছায় আমি বাটী আসিলাম। বৃদ্ধ গোপাল জ্যাঠা আমার হাতে একখানি পত্র দিল। পাঁচমাস পরে দূরদেশ হইতে প্রাণের বীণা আমায় পত্র দিয়াছে; আমি যেন কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পত্র পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে, "সুরেন! অনেকদিন পরে আজ তোমাকে আমি চিঠি লিখিতেছি। অবশ্যই তুমি শুনিয়া থাকিবে, জ্যেঠামহাশয় আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না। বাবা এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই এইখানের এক বড় মানুষের পুত্রের সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক করিয়াছেন। তুমি জানিও, আমার বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা যে কোন প্রকারে হউক, পালন করিবই। বোধ হয়, এই আমার শেষ পত্র।"

"তোমারই বীণা।"

আমার নিজের জন্য এখন আর নূতন চিন্তা কি আছে? বালিকা বীণার জন্য অনেক ভাবিলাম, এই নবীন বয়সে বিবাহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য না জানি, বীণা কোন্ বিপদসঙ্কুল পথ অবলম্বন করিবে। বাবার

সামান্য জ্বর হইয়াছিল, শীঘ্রই আরোগ্য হইলেন; আমার একদিন কলেজ কামাই হইল, আমি কলিকাতায় আসিলাম।

*   *   *   *

কলিকাতায় আমার তিনটি বৎসর এইরূপে কাটিল। এখন বাবা সময়ে সময়ে বিবাহের কথা তোলেন, আমার একই উত্তর, "এখন বিবাহ করিব না।"

চৈত্র মাস, রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, দিবসে নিদাঘের দারুণ গ্রীষ্মের পর ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর হইতে চলিল, আমার নিদ্রা আসিল না, পড়িতে বসিলাম, ভাল লাগিল না; ছাদের উপর চাঁদের আলোকে আসিয়া বসিলাম। আমার সাধের সাথী চিন্তা আসিয়া জুটিল, আকাশের পানে চাহিয়া কত মাথামুণ্ড ভাবিলাম। অতীতের স্মৃতিগুলি ক্রমে মনে আসিতে লাগিল,—আমাদের হুগলিতে আসা, বীণার সহিত আলাপ, উহাকে ভালবাসা—বিবাহের আশা, বীণার চিঠি; ইত্যাদি সবই একে একে হৃদয়পটে উদিত হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা দিতে লাগিল, এ যন্ত্রণার তুলনা আছে কি জানি না। মানব কল্পনাপ্রভাবে নরকের যাতনা যেরূপ মনোমধ্যে চিত্রিত করে, ইহা বোধ হয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক।

গির্জ্জার ঘড়িতে ৪টা বাজিল, চাঁদখানি অনেক নাবিয়া পড়িয়াছে, আমি পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছি। মহানগরী এখন অনেক শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। আমি দূরে শুনিলাম, বোধ হইল, আমার মত কোন হতভাগ্য ছাদে বসিয়া গাহিতেছে;—

গীত।

"সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা!
জনমের শোধ ডাকি মা তোমায়,
কোলে তুলে নিতে আয় মা!
পৃথিবীর কেউ ভালও বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।
যথা আছে শুধু ভালবাসা বাসি,
তথা যেতে প্রাণ চায় মা!
স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥"

অতি মধুর, বুঝি এত মধুর সঙ্গীত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই; ঐ গীত আবার শুনিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা মিটিল না; কিয়ৎপরে ঠিক ঐ ভাবের আবাব একটি গান শ্রুত হইল, আমি শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইলাম।

স্বপনে দেখিলাম, যেন বহু অন্বেষণের পর এক কাননে সন্ন্যাসিনীবেশে বীণাকে পাইয়াছি। বীণা তাহার জীবনে হুগলি ত্যাগের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সব বলিল। বৃক্ষতলে বসিয়া আমার বক্ষে মস্তক রাখিয়া কতই আনন্দাশ্রু ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে নামিয়া পড়িলেন; সন্ধ্যার অন্ধকার বিটপীকুলেব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া কাননকে গম্ভীরতর দেখাইতে লাগিল। আমবা দ্রুতপদবিক্ষেপে অরণ্যের ভিতর দিয়া গমন করিতেছি, সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিলাম এবং উভয়ে তাঁহার চবণে প্রণত হইলাম। দেবী বলিলেন,—"বৎস! এ জনমে তোমাদের আশা সফল হইবে না। পরজন্মে তোমাদের প্রণয় এইরূপই থাকিবে, অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে।" এই সময়ে আমাকে কে যেন ডাকিল, "সুরেন!" চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি—সম্মুখে গোপাল জ্যেঠা, মধ্যম মাতুল ও তাঁহার পুত্র, সকলের মুখেই কাতরভাব চিহ্ন দেখা যাইতেছে। এখন দিবাকর পূর্ব্বগগন উজ্জল কবিয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গোপাল জ্যেঠা তুমি হঠাৎ এসেচ?" গোপাল জ্যেঠার কোন উত্তর দিবাব পূর্ব্বেই মাতুল মহাশয় বলিলেন,—"তোমায় এখনই হুগলী যেতে হবে, বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

মনেব ভাব মুখে প্রকাশ পায়। আমি মামার এক কথায় ভুলিলাম না। বলিলাম,—"আমায় শীঘ্র বলুন কি প্রয়োজন, আপনাদের মুখ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, বাবার কোন বিপদ হ'য়েছে।" গোপাল জ্যেঠা বলিল,—"না; কিছু নয়, বাবুর জ্বর হয়েছে, তাই তোমায় দেখ্‌তে চাহেন।"

আমি আব কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, তখনই বাহির হইলাম, বাটী পৌঁছিতে ৯টা বাজিল। বাটীর সম্মুখেই দেখিলাম, আশু ডাক্তারের গাড়ী রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর গেলাম, পিসীমা আমাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন, বাবার ঘরে গিযা দেখি, যাহা ভাবিয়াছি, তাহাই হইয়াছে। বাবার শয্যাপার্শ্বে ডাক্তার বাবু ও দুই তিনটী প্রতিবাসী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমি বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া রোদন করিয়া ফেলিলাম, বোধ হয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্রের ক্রন্দনে পিতার পুনরায় অল্পক্ষণের জন্য

চেতনা আসিল। কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, ভাবে বুঝিলাম. নিকটে যাইতে কহিতেছেন, নিকটে গেলাম; অনেক কষ্টে হাত তুলিয়া আমার মস্তকে দিতে চেষ্টা করিলেন, তাহাও পারিলেন না।

ডাক্তারের পরামর্শে, গোপাল জ্যেঠা ও মামা প্রতিবেশীদের সাহায্যে বাবুকে তীবস্থ করিলেন। বেলা আন্দাজ ১টার সময় সকলই ফুরাইল। জীবনের একমাত্র অবলম্বন চিরদিনের জন্য হারাইলাম; আমার আঁধার জীবন আরো আঁধার হইল।

মাতুল মহাশয়দিগের ও প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে যথাসময়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মাতুল মহাশয়দিগের বিশেষ অনুরোধে প্রায় এক পক্ষ কলিকাতায় থাকিয়া বাটী আসিলাম। দাদাকে বিশেষ প্রয়োজন আছে, বলিয়া বাটী আসিতে পত্র লিখিলাম; দাদা আসিলেন।

সব শেষ হইয়াছে, আর কেন? কিসের আশায় সংসারে থাকিব। দাদার হাতে ধরিয়া, শিবপুর যাহাতে না যান, তজ্জন্য অনুরোধ করিলাম, আমাদের সংসারে থাকিয়া সকল বিষয় দেখিতে কহিলাম; বৃদ্ধ গোপাল জ্যেঠাকেও তাহাই কহিলাম। কাহারো নিষেধ না মানিয়া শীঘ্র ফিরিব, এই বলিয়া বিদেশ যাত্রা করিলাম। কলিকাতা ভিন্ন একাকী কখনও বাটীর বাহির হই নাই, ইহাই প্রথম। প্রথমেই বৈদ্যনাথ গেলাম, তথায় ৫।৭ দিবস থাকিয়া বৃন্দাবনে প্রায় একমাস থাকিলাম, তৎপরে দিল্লি, আগরা, লাহোর ইত্যাদি অনেক রমণীয় স্থানে, কোথাও ১০ দিন, কোথাও ১৫ দিন, কোথাও বা একমাস কাটাইলাম। এইরূপে প্রায় ৩ বৎসর নানা দেশে, পাহাড়ে, উপত্যকায় বেড়াইয়া অবশেষে পুনরায় কানপুরে আসিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে আমার উপযুক্ত বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। তথাকার প্রকৃতির শোভা অতি মনোরম, অদূরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শৈলরাজি বারিপূর্ণ জলদের ন্যায় দেখা যায়।

শোক, তাপ, বিরহ ইত্যাদি উপশম করিবার জন্য কেবলমাত্র সময়ই একমাত্র ঔষধ। কালে পিতৃবিয়োগজনিত শোকের অনেক হ্রাস হইল।

ব্রাহ্মণের পুত্র কন্যা কেহ নাই, আমাকে বিশেষ যত্ন করেন; আমিও তাঁহার সংসারের সকল ব্যয়ভার বহন করিতাম। এখন নির্জ্জন স্থানই আমার অধিক ভাল লাগে, দিবসের অর্দ্ধেক অংশ পাহাড়ে পাহাড়েই বেড়াই; অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজন হইলে রোগী দেখিতে যাই, কাহার নিকট হইতে অর্থ, গ্রহণ করি না।

প্রায় এক বৎসর পরে আমার চিকিৎসার বেশ প্রশংসা হইল; এখন দূরস্থিত অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও যাইতে হইত।

এক দিবস স্থানীয় ভদ্রলোকের বাটীতে চিকিৎসার্থে গমন করিতেছি, যে গৃহমধ্যে বসিয়াছি, তাহার ভিতরে একখানি ছোট টেবিলের উপর কএকখানি পুস্তক রহিয়াছে, তাহার একখানি মলাটের উপর একটি বিজ্ঞাপনে দাদার ও আমার নাম হঠাৎ আমার দৃষ্টিগোচর হইল, আগ্রহ সহকারে পাঠ করিলাম, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—"সুরেন। ভাই, তুমি শীঘ্র আসিব বলিয়া গিয়াছিলে, প্রায় ৪ বৎসর হইতে চলিল, এখনও আসিলে না কেন? যত শীঘ্র পার বাটী আসিবে, তোমার হুগলি ত্যাগের কএকমাস পরেই গোপাল জ্যেঠার মৃত্যু হইয়াছে। আমার কঠিন রোগ উপস্থিত, বোধ হয় রক্ষা পাইব না। স্বর্গীয় মাতুল মহাশয়ের বিষয় সম্পত্তি বোধ হয়, আর রক্ষা হয় না। আসিতে অন্যথা করিও না, যদি একান্ত বাটীতে থাকিবার না ইচ্ছা থাকে, তবে অন্ততঃ একবার আসিয়া সকল বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইও। আর জানিও, এই অন্তিম সময়ে তোমাকে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"—"তোমার যতীন দাদা।" কোন্ তারিখের কাগজ, দেখিবার জন্য মলাটখানি খুলিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখিতে পাইলাম না; সে স্থানটি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

অনেক দিন পরে আজ দাদার জন্য মন কাঁদিল। মনে করিয়াছিলাম, এ জনমে আর সংসারে লিপ্ত হইব না; কিন্তু আমি সামান্য মনুষ্য, থাকিতে পারিলাম না, সেই দিবসই যাত্রা করিলাম। ট্রেনে দাদার বিষয় নানা কুচিন্তা আসিয়া আমাকে অত্যন্ত কাতর করিল। যথাসময়ে বাটী পৌঁছিয়া শুনিলাম, প্রায় ৩ মাস হইল, দাদার মৃত্যু হইয়াছে। পিসিমা কোথায় গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারে না, বাটীতে কেবল আমাদের পুরাতন ভৃত্য হারাধন থাকে।

বাটীতে প্রবেশ করিয়াই একজন কৃষ্ণবর্ণ আন্দাজ সপ্তবিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবককে দেখিলাম, হারাধন তখন বাটীতে ছিল না। যুবকের নিকটে গমন

করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি কিয়ৎক্ষণ আমার মুখপানে চাহিয়া হঠাৎ বলিলেন,—"কে, সুরেন।" আমি প্রতি উত্তরে বলিলাম, "আজ্ঞা আমার নাম সুরেন।"

যুবক। সুরেন, ভাই, আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না, আমি তোমার সেই ভূষণ দাদা।

আমার অল্প অল্প মনে পড়িতে লাগিল। ইনি আমার পিতৃব্য পুত্র। দাদাকে দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইল, কারণ, আমার এইরূপ একজন আত্মীয়েরই প্রয়োজন। দাদা আমার পিতা ঠাকুরের মৃত্যুর জন্য ও উপস্থিত বিপদের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি, আমার আসিবার পূর্ব্ব দিন আসিয়াছেন।

দাদার মৃত্যুর পর আমাদের পাড়ার বিজয়বাবু আমার অন্বেষণের জন্য নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তিনিই তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। অবশেষে আমার কোন সন্ধান না পাইয়া বৈষ্ণপুরগ্রামে আমাদের আদি বাটীতে সংবাদ দিয়া দাদাকে আনান।

রাত্রেই আমি দাদাকে বলিলাম যে, কল্য প্রত্যূষে আমি চলিয়া যাইব। দাদা আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, অনেক উপদেশ দিলেন, বৈষ্ণপুরে গিয়া আমাদের পুরাতন বাটীতে থাকিবার জন্য ও বিবাহ করিবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন।

আমি বিশেষ কোন উত্তর দিলাম না, কেবল বলিলাম,—"আপনি এসেচেন ভালই হয়েচে, আমায় ক্ষমা করুন, আর আমাকে বাধা দিবেন না; বিবাহ করিয়া সংসারি হইবার বাসনা আর নাই।" দাদা চুপ করিয়া রহিলেন, আমি আবার বলিলাম,—"যাহা কিছু রহিল, আপনি সব দেখিবেন, আমার কিছুতে প্রয়োজন নাই; যদি পিসিমার সন্ধান পান, তবে তাঁহাকে বাটীতে আনাইয়া বিশেষ যত্নে রাখিবেন, আর হারাধন যতদিন বাঁচিবে, এইখানেই থাকিবে।"

দাদা বড়ই কাতর হইলেন, বার বার আমাকে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, যখন কোন মতেই স্বীকৃত হইলাম না, তখন তিনি আমার সঙ্গে আসিতে ইচ্ছা করিলেন। কথা কহিতে কহিতে অনেক রাত্রি হইল; দাদা ক্রমে নিদ্রিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইতে এখনো কিছু বিলম্ব আছে, সবে মাত্র পূর্ব্বদিকে ঈষৎ আলোক দেখা দিয়াছে, আমি ধীরে শয্যা ত্যাগ করিলাম, ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। আমাদের সাধের বাগানটি একবার দেখিবার জন্য মনে বড় সাধ হইল, বাগানে গেলাম, অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল, দুই চারিটা ফুলের গাছ এখনো রহিয়াছে। যে ঘাটের রোয়াকে বসিয়া কত দিন বীণার সহিত কত প্রাণের কথা কহিয়াছি, একবার সেই পবিত্র স্থানে বসিতে ইচ্ছা হইল, কত কথা মনে আসিল, পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, নয়নপ্রান্ত হইতে একবিন্দু বারি পতিত হইল। ক্রমে আলোক অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া, আমি চিরদিনের মত আমার সাধের বাগান ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই ষ্টেসনে আসিলাম। কানপুরের টিকিট লইলাম, গাড়ী আসিল, আমি আরোহণ করিলাম, যথাসময়ে কানপুরে পৌছিয়া সেই ব্রাহ্মণের কুটিরে গেলাম।

পূর্ব্বের ন্যায় আমার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, তবে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় নির্জ্জনে থাকিবার তত সুবিধা হয় না; কারণ এখন চিকিৎসার্থেই অধিক সময় অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয়বার বাটী হইতে আসিবার তিন বৎসর পরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল, তাহার যাহা কিছু সামান্য অর্থ ছিল, তাহার উপর আর কিছু দিয়া আমি কতকগুলি ব্রাহ্মণভোজন করাইলাম। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পরও আমি সেই কুটীর মধ্যে বাস করিতেছিলাম; কিন্তু কতকগুলি স্থানীয় ভদ্রলোকের অনুরোধে সহরের ভিতর একজন ভদ্রলোকের বাটীতে থাকিতে হইল।

দেখিতে দেখিতে আরো চারি বৎসর জলের মত চলিয়া গেল। এখন আমি সহরের মধ্যে প্রধান ডাক্তার বলিয়া পরিচিত; অনেক ধনী লোকের সহিত আলাপ। নিঃস্বার্থ হইয়া চিকিৎসা করাই আমার একমাত্র ব্রত। শ্রাবণ মাস, সারাদিন অবিরাম-ধারায় বৃষ্টি হইতেছে; বেলা ৫টা বাজিয়াছে, মনে হইতেছে যেন সন্ধ্যা হইয়াছে, এই সময়ে আমাদের বাটীর দরজায় একখানি গাড়ী থামিল। দরোয়ান্ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল, বসন্তপুর হইতে একজন বাবু আসিয়াছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন। আমি তৎক্ষণাৎ বাবুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বসিতে কহিলাম, তিনি বসিলে ন

না, আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আপনাকে এখনি যেতে হবে।" আমি পত্রপাঠে অবগত হইলাম, বসন্তপুর হইতে ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিতেছেন, তথাকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের বাটীতে একটি জ্বর অতিসারের রোগী আছে; তাহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে, অতএব আমাকে শীঘ্র যাইতে হইবে।

আমি বিলম্ব না করিয়া বাবুটীর সহিত গেলাম। একটি বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে শকট থামিল; বাটীর ভিতর ঢুকিতে আমার পদদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল; অন্তরে এক অনির্দ্দিষ্ট ভাবের উদয় হইল। শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া প্রবেশ করিলাম।

শুনিলাম, যাহার জন্য আমি আনিত হইয়াছি, তিনি স্ত্রীলোক, প্রায় আড়াই মাস কাল জ্বর অতিসার রোগে ভুগিতেছেন। যখন পীড়িতার নিকট আমাকে লইয়া গেল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিলাম, যাহা যাহা প্রয়োজন সকল বিষয়ই পরীক্ষা করিলাম; বিশেষ কোন দোষ দেখিলাম না, জ্বর কেন ছাড়ে না, বুঝিলাম না। অদ্য আমি ঔষধাদির কোন ব্যবস্থা করিলাম না, কল্য প্রাতেঃ আসিব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

বাটী আসিয়া অনেক চিকিৎসাগ্রন্থ দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই রোগ ঠিক করিতে পারিলাম না। পরদিবস প্রাতঃ ৮টার সময় যোগেশবাবুর বাটী হইতে গাড়ী আসিল, আমি যাইলাম। যোগেশ বাবুদের বাটীর চিকিৎসক তথায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম, গত কল্য শেষ রাত্রি হইতে নাড়ীর অবস্থা ভাল নাই। আমি শীঘ্র রোগীকে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম; যোগেশ বাবু আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। আমি নাড়ী দেখিবার জন্য হস্ত বাহির করিতে বলিতেছি; দেখিলাম, রোগীর সমস্ত অঙ্গ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছে, রোগী মূর্চ্ছিতা। গাত্রের আবরণ খুলিয়া দিয়া জোরে বাতাস করিতে বলিলাম, যোগেশবাবু ও বাটীর অপর সকলে বড়ই চিন্তিত হইলেন। আমি সাহস দিয়া বলিলাম, কোন ভয় নাই, এখনি আরোগ্য হইবেন। বৃদ্ধ যোগেশবাবু, মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে বারবার বিনদা, বিনদা বলিয়া, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রায় ১০ মিনিট পরে মূর্চ্ছা ভাল হইল; একবার চাহিয়া দেখিলেন। সেই চাহনির বিশেষ কিছু অর্থ নাই; কারণ, এখনো মূর্চ্ছার সম্পূর্ণ ঝোঁক কাটে নাই; আমি দুই চামচ দুগ্ধ দিতে কহিলাম।

হায়। এখনও বুঝি নাই যে, এই বিনোদাই আমার বীণা, কেবল মুখ দেখিয়া অবধি মনে হইতেছিল, এ মুখ পরিচিত; কোথা দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি, তাহা মনে হইতেছে না।

অল্পক্ষণ পরেই রোগী বেশ সুস্থ হইলেন, দেখিলাম, জ্বর অতি সামান্য আছে। বাম হস্ত দেখিয়া নাড়ীর অবস্থা ভাল মনে হইল না; দক্ষিণ হস্ত দেখিতে যাইতেছি, দেখিলাম, হস্তের মনিবন্ধে একটি কি লেখা রহিয়াছে; চক্ষু নিকটে লইয়া দেখিলাম, একটি ইংরাজী "S" লেখা রহিয়াছে। অকস্মাৎ যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। নাড়ী দেখিতে ভুলিয়া সপ্তদশ বৎসরের পুরাতন স্মৃতি মনে আসিল; সমস্ত অঙ্গে যেন তাড়িৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীণার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, নয়নে অশ্রুকণা ঝরিতেছে। আমাকে বলিল,—"এখনও চিনিতে পারিলে না ?" চক্ষু মুছিতে মুছিতে উত্তর দিলাম,—"বীণা। চিনেছি চিনেছি।"

বীণা আমাকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া বলিল,—"আজ আমি অনেক ভাল আছি।"

আমি বলিলাম,—"এখন জ্বর অল্পই আছে, ভয় কিছু নাই, শীঘ্রই ভাল হবে।"

বীণা। না, সে আশা আর নাই, তোমাকে দেখ্‌বো বলেই বোধ হয় এখনো প্রাণ বেরোয়নি।

সেই ঘরে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই আমাদের কথোপকথনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বীণা যোগেশ বাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল,—"বাবা! ইনিই আমার স্বামী।"

আমি অনেক কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, তাহাদের গৃহচিকিৎসক অক্ষয়-বাবুর সহিত যুক্তি করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা পত্র লিখিলাম।

ঔষধ আসিলে আমি স্বহস্তে তাহার এক দাগ খাওয়াইয়া দিলাম। অদ্য আর বাটী গেলাম না, রায় মহাশয়দের বাটীতে রহিলাম। অপর ঔষধ অপেক্ষা উত্তেজক পথ্য ও ঔষধ দেওয়াই উচিত মনে করিলাম, কিন্তু উদরের পীড়া থাকাতে দুগ্ধ বা তৎসদৃশ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না, এক ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিতে লাগিলাম।

দুই প্রহরের পর জ্বর নাড়ীতে অতি সামান্যই রহিল, দেহের উত্তাপ রহিল না। গৃহস্থেরা মনে করিল, আজ বীণা অনেক ভাল আছে; এবং আমার

ঔষধেই উপকার হইয়াছে। আড়াই মাস ক্রমাগত জ্বর আসিতে আসিতে হঠাৎ এতটা রিমিসন্ আমার মঙ্গলজনক মনে হইল না। আশু বিপদের চিন্তাই মনে হইতে লাগিল। বৈকালে জ্বর আসিল, আমি বরং আহ্লাদিত হইলাম, ঐ জ্বর রাত্রি দশটার পর অত্যন্ত প্রবল হইল, ঐ সঙ্গে আমারও ভয় হইল; মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতে লাগিল। আমাকে নিকট হইতে নড়িতে দিল না, চতুর্দ্দিকেই যেন কি বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম, তথাপি কোন উপকার বোধ হইল না। আবার রাত্রি চারিটার সময় হইতে জ্বর কমিতে লাগিল; প্রাতেঃ নয়টার সময় পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় বাহিরে বেশ বিজ্বর হইল, কিন্তু রোগীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, দুর্ব্বলতা বশতঃ কথা কহিবার শক্তি অনেক হ্রাস হইয়াছে।

বৈকালে যখন বীণাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য উহার নিকটে যাই, তখন ঘরে বিশেষ কেহ ছিল না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বীণা! এখন কেমন আছ?" উত্তর দিল,—"এখন কোন যাতনা নাই, বেশ ভাল আছি।"

আমি ঔষধ দিতে যাইতেছি, বীণা বলিল,—"আর কেন, আমাকে কি বাঁচাতে পারবে?" আমায় কাঁদিতে দেখিয়া আবার বলিল,—"সুরেন! কাঁদ কেন ভাই! আমার এই শেষ সময় তোমায় দেখ্‌তে পেলাম, আমার সব সাধ মিটিল। তোমায় আমায় বাহিরে বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু আমার অন্তরে একদিনের তরেও তুমি ছাড়া আর কেহ স্থান পায় নাই; তুমি আমার দেবতা।"

আমার কোন কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না, বীণা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখানে কবে এলে? আমি অতিকষ্টে সংক্ষেপে পিতার মৃত্যুর পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সব বলিলাম। বীণার চক্ষের জলে আবার উপাধান ভিজিল। আমি আমার বস্ত্রদ্বারা চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

বীণা। আমার কথা কহিতে আজ কষ্ট হইতেছে। অনেক কথা বলিবার ছিল, বোধ হয় আর বলা হইল না। তোমার কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমিও বিবাহ কর নাই। আজ আমার শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে, তুমি বিবাহ করিয়া সংসারি হও।

আমি বলিলাম,—"বীণা! তোমার সব অনুরোধ রাখিতে পারি, কিন্তু এটী পারিব না, আমার ক্ষমা কর।"

বীণা আরও কি বলিতেছিল, এমন সময়ে ঘরে লোক আসিল, আর বলা হইল না।

এখন আমার মনের-ভাব কিরূপ হইল, তাহা প্রকাশ করিবার শব্দ বোধ হয় ভাষায় নাই। সন্ধ্যার পরেই পুনরায় জ্বর আসিল, রাত্রি এগারটার সময় দেহের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি হইল, লক্ষণ সকল ক্রমেই খারাপ হইতে আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ যোগেশবাবু কাতরস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন দেখ্‌লেন বাবু?" আমি বলিলাম, এই জ্বর ছাড়িবার সময় বিশেষ আশঙ্কা আছে। বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন, আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্থির হইতে বলিলাম। বৃদ্ধ বলিলেন, "একটা পোষা পাখি মরে গেলে কত কষ্ট হয়, আর বিনদা প্রায় ১৪।১৫ বৎসর আমার বাড়ীতে আমার মেয়ের মত আছে; কেমন করে আর আমি স্থির থাকি?"

দুইটার পর হইতে জ্বর কমিতে আরম্ভ করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দেহ একেবারে শীতল হইল। হস্তপদে অগ্নির উত্তাপ দিতে কহিলাম, ঔষধ দিলাম, উদরস্থ হইল না। দুগ্ধ দিলাম, তাহাও গলাধঃকরণ হইল না। অনেকবার উচ্চৈঃস্বরে "বীণা, বীণা" বলিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর নাই, দেখিলাম, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে; সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে আনিল।

সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল; বীণা জন্মের মত চলিয়া গেল।

শ্রীহরিহর শেঠ।

সপ্তম বর্ষ সম্পূর্ণ।
